ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা ।। ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ২৫ মে, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

বিজেপিকে বাদ দিয়ে

সি পি এম বিনাশ অসম্ভব

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। বিজেপি'কে ছাড়া রাজ্যে সি পি এম বিরোধী লড়াই যে অসম্পূর্ণ তা লোকসভার ফলাফলই প্রমাণ করে দিয়েছে। বিজেপির ভোট কাটার ফলে রাজ্যে ছটি আসনে সিপিএম জিতে গিয়েছে। একটি আসনে ঝাড়খন্ড পার্টির ভোট কাটাকুটির ফলে বামেরা বিজয়ী হয়েছে। অর্থাৎ এই ভোট কাটাকুটির খেলা না হলে রাজ্য থেকে সিপিএম সমূলে উৎখাত হয়ে যেত। বিরোধী জোটের আসন সংখ্যা দাঁড়াতো ৩৪। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সহজ সত্যটি বুঝতে পারছেন না। অথবা সংখ্যালঘু তোষণের জন্য বুঝতে চাইছেন না। ঘুরপথে বিজেপি যে এখনও বাম বিরোধী ভোট এক বাক্সে ফেলার ক্ষেত্রে নির্ণায়ক শক্তি তা তৃণমূল সুপ্রিমোকে বুঝতে হবে। রাজ্যের লোকসভা ভোটের ফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে কোচবিহার আসনে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী জিতেছে ৩৩ হাজার ভোটে। বিজেপি এই আসনে ভোট পেয়েছে ৬৫ হাজার। আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রের আর এস পি প্রার্থী জিতেছেন ১ লক্ষ ২৩ হাজার ভোটে। বিজেপি প্রার্থী ভোট পেয়েছেন প্রায় ২ লক্ষ। জলপাইগুড়ি আসনে সিপিএম জিতেছে ৮৮ হাজার ভোটে। এখানে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট ৯৪ হাজার। বালুরঘাট আসনে তৃণমূল প্রার্থী হেরেছেন মাত্র ৫ হাজার ভোটে। অথচ বিজেপি ভোট পেয়েছে ৬০ হাজার। মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলপ্রার্থী হেরেছে ৪৮ হাজার ভোটে। বিজেপি পেয়েছে সাড়ে ৫২ হাজার ভোট। বর্ধমান পূর্ব আসনে সিপিএম জিতেছে ৫৯ হাজার ভোটে। এই কেন্দ্রে বিজেপি'র প্রাপ্ত ভোট ৭১ হাজার ৬৩২। এছাড়া পুরুলিয়া কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী ১৯ হাজার ভোটে হারলেও ঝাড়খণ্ড পার্টি ৩১ হাজার ভোট কেটে নিয়েছে। বিজেপি একটি সর্বভারতীয় দল। নির্বাচনে হার-জিত আছে। তা বলে কোনও জাতীয় দল আঞ্চলিক দলের কাছে আত্মসমর্পণ করে ফেলবে তা হতে পারে না। বিজেপি সেই কারণেই ৪২টি কেন্দ্রেই প্রার্থী দিয়েছিল। সি পি এম বিরোধী তীব্র হাওয়ায় ভোটাররা কাকে ভোট দেবেন তা আগেই মনস্থির করে নিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও বিজেপির প্রাপ্ত কমিটেড ভোটের এক চুল ফারাক হয়নি। তৃণমূল নেত্রী এটা কবে বুঝবেন?

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি'র ভোটব্যাঙ্ক অটুট

গূঢ়পুরুষ ।। জনরোষে পশ্চিমবঙ্গে বাম দুর্গ ধূলিসাৎ। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে তিন দশকেরও বেশি অপরাজিত লাল দুর্গ। যথেচ্ছ রিগিং, সন্ত্রাস কোনও কিছুই রক্ষা করতে পারেনি এবার কম্যুনিস্টদের সাজানো সংসার। অন্য রাজ্যের কথা জানি না। পশ্চিমবঙ্গে লোকসভার নির্বাচনে অন্তত কোনও জাতীয় ইস্যু ছিল না। এই রাজ্যে ভোটদাতাদের কাছে প্রধান বিষয় ছিল বাম জমানার অবসান। কেন্দ্রে কোনও দল বা জোট সরকার গড়বে এমন বিতর্ক থাকলে তৃণমূল কংগ্রেস এতগুলি আসন পেত না। কারণ, তৃণমূল বা বামেরা কেউই কেন্দ্রে যে সরকার গড়বে না তা সকলেরই জানা ছিল। কেন্দ্রে সরকার গড়তে পারে কংগ্রেস অথবা বিজেপি জোট। আঞ্চলিক দল নয়। অন্যান্য রাজ্যে তাই ভোট পড়েছে কংগ্রেস বা বিজেপি-র জোটের পক্ষে। আঞ্চলিক দলগুলি তাই প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মায়া-লালু-পাশোয়ানদের ব্ল্যাকমেলের রাজনীতি চলতে দেয়নি সচেতন ভোটদাতারা। পশ্চিমবঙ্গে তেমনটি হয়নি। অবশ্য অন্য একটি যুক্তিও আছে। বলা হচ্ছে যে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করায় কংগ্রেসের পালের হাওয়ায় তৃণমূলের এই অভাবিত সাফল্য। তাই যদি হয় তবে দক্ষিণবঙ্গের একটিও আসনে কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়ী হয়নি কেন? বিগত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ছয়টি আসন ছিল। এবারও তাই আছে। সুতরাং বিহার বা উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তুলনা করা ঠিক নয়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বাম অপশাসনের, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের জমা রোষ উগরে দিয়েছে। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে বলতে হয় যে এবারের ভোট বামেদের বিরুদ্ধে যতটা, ততটা নিশ্চিতভাবেই কংগ্রেস-তৃণমূলের জোটের রাজনীতির পক্ষে নয়। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় "নেগেটিভ ভোট।"

বরং বিজেপি প্রার্থীরা এই রাজ্যে যে ভোট পেয়েছেন তা আসন জেতার জন্য যথেষ্ট না হলেও "পজিটিভ ভোট"। বিজেপি-র নীতি ও রাজনৈতিক মতাদর্শের পক্ষেই ভোটদাতারা তাঁদের সমর্থন জানিয়েছেন। এই কারণেই রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় বঙ্গেই বিজেপি প্রার্থীরা গড়ে ৫০-৬০ হাজার ভোট পেয়েছেন। দার্জিলিং আসনটি বিপুল ভোটে বিজেপি-র প্রার্থী যশোবন্ত সিং জিতেছেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সমর্থনে। পশ্চিমবঙ্গের এই আসনটি বাদে অন্য সমস্ত লোকসভা আসনেই বিজেপি প্রার্থীরা লড়েছেন একাই। দলের নিজস্ব সংগঠন ও নীতিকে সামনে রেখে। কোনও জোটের ছত্রছায়ায় নয়। অর্থাৎ বিজেপি-র ভোট একান্তই তার নিজস্ব ভোট। সেখানে জল মেশানো নেই। নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র নিজস্ব ভোট ব্যাঙ্ক আছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের সময় দলের এই ভোট ব্যাঙ্ক একটা বড়সড় চমক দেবে। বিজেপি এবার রাজ্যের সব আসনে প্রার্থী দেওয়ায় অনেকেই ভ্রু কুঁচকে ছিলেন। তৃণমূল নেত্রী তো স্পষ্টই বলেছিলেন, ভোট বিভাজন করে সি পি এমকে জেতাতেই রাজ্যের সব আসনে বিজেপি প্রার্থী দিয়েছে। বিজেপি একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল। একটি জাতীয় দল যদি সব আসনে প্রার্থী দিতে না পারে তবে সেটা যথেষ্ট লজ্জার। তাছাড়া বিজেপি কট্টর বাম বিরোধী জেনেও মমতা প্রচার করেছেন বিজেপি-সিপিএম গোপন আঁতাত হয়েছে। এমন একটা অসম্ভব কথা তিনি কীভাবে বললেন জানতে ইচ্ছে করে। কোথাও কি তাঁর বিবেক দংশন হয়নি? এই অপপ্রচার সত্ত্বেও বিজেপি প্রার্থীরা অধিকাংশ আসনে যে ভোট পেয়েছেন তা যথেষ্ট সম্মানজনক। তাই বলছি, বিজেপির ভোট পজিটিভ। কংগ্রেস-তৃণমূল জোটের পক্ষে ভোট আদতে 'অ্যান্টি এস্টাবলিসমেন্ট' ভোট। এই ভোট তৃণমূলের পক্ষের ভোট নয়। সি পি এমের বিরুদ্ধ ভোট। অর্থাৎ নেগেটিভ ভোট। যে কোনও সময় এই ভোট অন্যদিকে ঘুরে যেতে পারে। যেমন, রাজ্যের মুসলিম ভোট বিগত তিন দশক ধরে লাল পার্টিকেই সমর্থন দিয়েছে। এবার সেই ভোট

(এরপর ৪ পাতায়)

লোকসভা - ২০০৯ ঃ রাজ্যে বিজেপি প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোট

প্রার্থী	কেন্দ্র	প্রাপ্ত ভোট
ভবেন্দ্রনাথ বর্মন	কোচবিহার	৬৫,৩২৫
মনোজ টিগ্গা	আলিপুরদুয়ার	১,৯৯,৮৪৩
দীপেন্দ্রনাথ প্রামাণিক	জলপাইগুড়ি	৯৪,৩৭৩
যশোবন্ত সিং	দার্জিলিং	৪,৯৭,৮৪৯
গোপেশচন্দ্র সরকার	রায়গঞ্জ	৩৭,৬৪৫
সুভাষচন্দ্র বর্মণ	বালুরঘাট	৫৯,৭৪১
অম্লান ভাদুড়ি	মালদহ (উঃ)	৬১,১১৫
দীপককুমার চৌধুরি	মালদহ (দঃ)	৪৩,৯৯৭
কৃষ্ণপদ মজুমদার	বনগাঁ	৪২,৬১০
প্রভাকর তেওয়ারি	বারাকপুর	৩০,৯২১
তপন শিকদার	দমদম	৫৫,৬৭৯
ব্রতীন সেনগুপ্ত	বারাসাত	৫৫,৩৫৩
নীরদচন্দ্র হালদার	জয়নগর	২৪,৬০০
বিনয়কুমার বিশ্বাস	মথুরাপুর	২৭,৪৩২
অভিজিৎ দাস	ডায়মন্ড হারবার	৩৭,৫৪২
সনৎ ভট্টাচার্য	যাদবপুর	২৫,৩২৪
জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়	দঃ কলকাতা	৩৯,৭৪৪
তথাগত রায়	কলকাতা উত্তর	৩৭,০২৫
পলি মুখোপাধ্যায়	হাওড়া	৩৭,৭২৩
রাহুল চক্রবর্তী	উলুবেড়িয়া	৪২,৪৩৪
দেবব্রত চৌধুরি	শ্রীরামপুর	৩৮,৪৭৬
চুনীলাল চক্রবর্তী	হুগলি	৩৯,৭৮৪
মুরারী বেরা	আরামবাগ	৫৭,৯০৩
সূর্য রায়	আসানসোল	৪৯,৬৪৬
আলি আফজল চাঁদ	বর্ধমান-দুর্গাপুর	৫০,০৮১
শঙ্কর হালদার	বর্ধমান (পূঃ)	৭১,৬৩২
তাপস মুখোপাধ্যায়	বীরভূম	৪৭,০৬৭
অর্জুন সাহা	বোলপুর	৭০,০৮৪
সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়	কৃষ্ণনগর	১,৭৫,২৮৩
সুকল্যাণ রায়	রানাঘাট	৫৭,৮৪৪
রাহুল সিন্‌হা	বাঁকুড়া	৪২,৬৬০
রাজ্যশ্রী চৌধুরি	তমলুক	২০,৫৭৩
অমলেশ মিশ্র	কাঁথি	৩১,৯৫২
প্রদীপ পট্টনায়ক	মেদিনীপুর	৫২,৮০০
মতিলাল খাটুয়া	ঘাটাল	৩৫,০০৪
দেবাশিস মজুমদার	জঙ্গিপুর	২৮,১৪৯
বিদ্যুৎ হালদার	বহরমপুর	২৭,৫২২
নির্মল সাহা	মুর্শিদাবাদ	৪২,২৯০
স্বপন দাস	বসিরহাট	৬৮,০১৪
জয়ন্ত মন্ডল	বিষ্ণুপুর	৪১৯০৮
সায়ন্তন বসু	পুরুলিয়া	২১৫০৯
নবেন্দু মাহালি	ঝাড়গ্রাম	৪৫৪২৫

পরাজয়ের মাঝেও ওড়িশায় আলোর রেখা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। অপ্রত্যাশিত ও অভূতপূর্ব পরাজয়ের মাঝেও ওড়িশায় বিজেপি'র পক্ষে সূক্ষ্ম অথচ সুস্পষ্ট আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে এবং সেই দাঙ্গাদীর্ণ কন্ধমাল জেলাতেই। দলের হিন্দুত্বভিত্তিক রাজনীতির সুফলও সেখানেই মিলেছে। জেলার তিনটি বিধানসভার দু'টিতে বিজেপি'র প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন।

আশ্চর্যজনকভাবে জিতেছেন মনোজ প্রধান। গত বৎসর কন্ধমাল জেলা জুড়ে জাতি দাঙ্গা ঘটেছিল হিন্দু ও খৃস্টানদের মধ্যে। বিজেপি তখন নবীন পট্টনায়কের নেতৃত্বে বিজেডি দলের রাজ্য সরকারের অংশীদার ছিল। সেই দাঙ্গায় অভিযুক্ত হয়ে মনোজ প্রধান গত বছরের অক্টোবর থেকেই উদয়গিরি জেলে। জেলে থেকেই প্রার্থী হয়েছিলেন মনোজ উদয়গিরি কেন্দ্রে। একদিনের জন্যও প্রচারে আসতে পারেননি তিনি। তবুও তিনি ভালোরকম ব্যবধানে কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করেছেন। এই কেন্দ্রে বিজেডি প্রার্থী তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

একই রকমভাবে বালিগুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে কট্টর হিন্দুত্ববাদী করেন্দ্র মাঝিও ৩১০০ ভোটের ব্যবধানে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করেছেন। তৃতীয় আসন ফুলবনী কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী দেবনারায়ণ প্রধান বিজেডি

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life গীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

কর্ণাটক

কংগ্রেস ঝড় থমকে গেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সারা দেশে কংগ্রেস ঝড় বইলেও বিজেপি শাসিত রাজ্য কর্ণাটকে তা থমকে গিয়েছে। এজন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস ইয়েদুরাপ্পা তাঁর উন্নয়ণমূলক কাজকেই প্রধান কারণ বলে মন্তব্য করেছেন। বড় বড় শহরে সারা দেশে বিজেপি ভালো ফল করতে পারেনি। কিন্তু রাজ্যের রাজধানী বাঙ্গালোর শহরের তিনটি আসন — বাঙ্গালোর মধ্য, বাঙ্গালোর দক্ষিণ এবং বাঙ্গালোর উত্তর আসনে বিজেপি প্রার্থীরা ভালো ব্যবধানে জয়লাভ করেছেন। তাঁরা কংগ্রেসের অনেক মহারথীদের কুপোকাৎ করেছেন। বাঙ্গালোর দক্ষিণ কেন্দ্রে বিজেপি নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এইচ এন অনন্তকুমার পঞ্চমবার জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। তিনি কংগ্রেসের যুবনেতা কৃষ্ণা বাইরেগৌড়াকে পরাজিত করেছেন।

রাজ্যে মোট আসন সংখ্যা ২৮টি। এবার বিজেপি গতবারের তুলনায় একটি বাড়িয়ে মোট ১৯টি আসন দখল করেছে। নির্বাচনের আগে ইয়েদুরাপ্পাকে অনেক বদনাম করার চেষ্টা চলেছিল। কেননা, নানারকম স্থানীয় কারণে বেশ কয়েকটি চার্চ আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। রাজ্যে কংগ্রেস ৬টি এবং দেবেগৌড়ার জে ডি (এস) তিনটি আসনে জয়লাভ করেছে। তবে বিজেপি আরও তিনটি আসন কম ব্যবধানে হেরেছে।

ইয়েদুরাপ্পা

অন্ততপক্ষে কুড়িটি আসনে জয়লাভের লক্ষ্যে বিজেপি রাজ্যে নির্বাচনে নেমেছিল। কংগ্রেসের যেসব নামজাদা প্রার্থীরা পরাজিত হয়েছেন তাদের মধ্যে আছেন — এস বঙ্গারাপ্পা, মার্গারেট আলভা, জনার্দন পূজারি, জাফর শরীফ এবং এম এইচ অম্বরীষ। দুজন প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ ভারত-আমেরিকা পারমাণবিক চুক্তির স্বপক্ষে দলের হুইপ অমান্য করে কংগ্রেসকে সমর্থন করেছিলেন। তারা এবার কংগ্রেস দলের টিকিটে সংসদীয় নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। তবে তাদের ভরাডুবি হয়েছে। এই দুই স্বনামধন্য নেতা হলেন — মঞ্জুনাথ কুন্নুর এবং এইচ টিসাঙ্গলিয়ানা।

কেন্দ্রে এবার অপ্রাসঙ্গিক বামেরা

অর্ণব নাগ।। আচ্ছা, ১৬ তারিখ সারাদিন প্রকাশ কারাট কি করছিল বলুন তো? রোম সাম্রাজ্য পোড়ার সময় সম্রাট নিরোর বেহালাবাদনের ঘটনার উল্লেখ করে সিপিএমের বেঙ্গল লাইনের রসিকতা হল — উনি ওইদিন নির্ঘাৎ কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো পড়ে দেশে বিকল্প আর্থিক নীতি গ্রহণের খসড়া প্রস্তুত করছিলেন বা নেপালে মাওবাদীদের ক্ষোভকে কেন্দ্র করে নিজে ভারত সরকারের ওপর তাত্ত্বিকভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিলেন। সবটাই ইয়ার্কি সন্দেহ নেই। কিন্তু ঘটনা হল দলে কট্টরপন্থী হিসেবে পরিচিত প্রকাশ কারাট গত কয়েক মাসে আদর্শের নামে এমন সব কান্ড -কারখানা করেছেন যার দরুণ আজ পার্টির হাঁড়ির হাল হয়েছে। ইতিপূর্বে, ৯৬-তে প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রশ্নে জ্যোতি বসুকে না করে দলে বিতর্কের সম্মুখীন হয়েছিলেন কারাট। পরবর্তীকালে জ্যোতি বসু যাকে 'ঐতিহাসিক ভুল' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। যাই হোক, এর পরবর্তী পর্যায়ে দলের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক হরকিষেন সিং সুরজিতের আমলে গত লোকসভা নির্বাচনের পরে কেন্দ্রে সরকার গঠনের প্রশ্নে সরাসরি কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকারে যোগ না দিলেও তথাকথিত সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে ঠেকানোর তাগিদে তাদের বাইরে থেকে সমর্থন দেয়। এবং কংগ্রেসের, একান্ত অনুরোধে, স্পীকার পদটি গ্রহণ করে সিপিএম! সেই পদে আসীন হন সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। সরকারে না থাকলেও কেন্দ্রে ছড়ি ঘোরানোর কাজটি এরপর বিগত সাড়ে চার বছর ধরে ভালোভাবেই করে গেছে সিপিএম। গত ২০০৪-এ লোকসভা নির্বাচনের এক বছর পরেই শারীরিক কারণ দেখিয়ে পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে অপসারিত করা হয় সুরজিতকে। ক্ষমতায় আসেন প্রকাশ কারাট। এসেই একের পর এক কান্ড ঘটিয়ে দলকে ফেলে দেন চরম অস্বস্তির মধ্যে। পঞ্চ দশ লোকসভা নির্বাচনের ছ'মাস পূর্বে আমেরিকার সঙ্গে পরমাণু চুক্তি নিয়ে আচমকাই সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন কারাট। কারাটের মূল রাগ ছিল সরকার কেন আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি করছে! এই নিয়ে চীন বা রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি হলে বোধহয় প্রকাশ কারাট একে সমর্থন করতেন! এই সমর্থন প্রত্যাহারই শেষ পর্যন্ত কাল হল। কারাটদের টাইট দিতে সনিয়া উদ্যোগী হলেন রাজ্যে তৃণমূলের সঙ্গে জোট করতে। ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েতে ফলের ভিত্তিতে দুটি জেলা পরিষদ দখল করে উজ্জীবিত হয়েই ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। এই সর্বাত্মক জোট যে, আড়াইটে রাজ্যে টিকে থাকা সিপিএমের বিপদ ডেকে আনবে এ রাজ্যে তা বোধহয় বুঝতে পারছিলেন সিপিএমের রাজ্যনেতারা। কিন্তু তাঁরা সেটা

প্রকাশ কারাত

বোঝাতে পারছিলেন না প্রকাশ কারাটকে। কারাটের গোঁয়ার্তুমি দেশের মানুষ যে ভালোভাবে নেয়নি তা ভোটের ফলেই স্পষ্ট। আরেকটা বিপদজনক দিক হল কমিউনিজমের আন্তর্জাতিকতার দোহাই দিয়ে একের পর এক দেশের স্বার্থবিরোধী কাজ করে যাচ্ছিলেন কারাট। সম্প্রতি নেপালের মাওবাদীদের ভারত বিরোধিতায় প্রত্যক্ষ মদত ছিল কারাটের। পার্টির খারাপ ফল হওয়ার সম্ভাবনা দেখে ভোটের আগে তিনি তৎপর হয়েছিলেন তৃতীয় বিকল্প নামে একটি জগাখিচুড়ি তৈরি করতে। মায়াবতী, জয়ললিতা, চন্দ্রবাবু নাইডু প্রমুখ একাধিক প্রধানমন্ত্রীত্বের দাবিদার নিয়ে তৈরী হয় তৃতীয় ফ্রন্ট। মওকা বুঝে গোঁয়াতুর্মি ছেড়ে পঞ্চ দশ ভারত সরকারে যোগ দেবার কথাও আগাম ঘোষণা করে দেন কারাট। যাদের নিয়ে গঠিত তৃতীয় ফ্রন্ট অর্থাৎ মায়াবতীর বহুজন সমাজবাদী পার্টি, এ আই ডি এম কে জয়ললিতার, চন্দ্রবাবুর টি ডি পি এবং বামেরা — এরা প্রত্যেকেই মূলত আঞ্চলিক দল। সর্বভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষিতে আঞ্চলিক দলগুলির উত্থান কিন্তু এক অর্থে দেশের স্থিতাবস্থায় আঘাত। এই প্রত্যেকটি আঞ্চলিক দলই ভারতীয় ভোটারদের একটি চতুষ্পদ জীব ছাড়া আর কিছুই ভাবে না। এরা দেশে ক্ষমতায় এলেও শুধুমাত্র আঞ্চলিক ধান্দা মেটানোর তাগিদে যে দেশের অস্থিরতা সৃষ্টি করবে এ বিষয়ে বোধ হয় নিঃসন্দেহ ছিলেন দেশের নির্বাচকমন্ডলী। ওই নেতা-নেত্রীদের ফলাফল দেখলেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। মায়াবতীর ঘাঁটি উত্তরপ্রদেশে গত লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় কংগ্রেসের ১২টি আসন বেড়ে হয়েছে ২১টি, সেখানে অপরিবর্তিতই রয়েছে মায়াবতীর আসন সংখ্যা অর্থাৎ ১৯টি। তামিলনাড়ুতে জয়ললিতার এ আই এ ডি এম কে পেয়েছে ৯টি আসন, তাদের জোটসঙ্গী বামেরা পেয়েছে মাত্র২টি আসন। যা গতবারের থেকেও দুটি কমেছে। জয়ললিতার নতুন জোটসঙ্গী প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী অম্বুমণি রামাডসের পি এমকে-র ভাগ্যে লোকসভা আসন এবার শিকে ছেঁড়েনি। সেখানে কংগ্রেস ওই রাজ্যে পেয়েছে ৭টি আসন এবং তাদের জোট-সঙ্গী ডিএমকের কপালে জুটেছে ১৮টি আসন। চন্দ্রবাবু নাইডুর অন্ধ্রপ্রদেশে কংগ্রেস পেয়েছে ৩৩টি আসন, অন্যদিকে নাইডুর টিডিপি পায় মাত্র ৬টি আসন। ভোটের ফলে একটা জিনিস অত্যন্ত স্পষ্ট। যে সব রাজ্যে আঞ্চলিক দলগুলির সমর্থনে প্রকাশ কারাট তৃতীয় ফ্রন্টের খোয়াব দেখছিলেন সেখানকার রাজ্যবাসী অন্তত রায় দিয়েছেন কেন্দ্রে স্থায়িত্বের পক্ষেই। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলবাসীরাও সেই পথই অনুসরণ করায় বামঘাঁটির হাল শোচনীয়। পশ্চিমবঙ্গে বামেরা পেয়েছে মাত্র ১৫টি আসন যা গতবারের থেকে কুড়িটি কম। কেরলে বামেদের দখলে মাত্র ৪টি আসন। সব মিলিয়ে গতবার ৬৩টি আসন ছিল বামেদের। তা এক ধাক্কায় কমে দাঁড়িয়েছে ২৪টিতে। কেন্দ্রে পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ভারত সরকারকে দুর্বল করার যাবতীয় ক্ষমতাই লুপ্ত হয়েছে বামেদের। চতুর্থ দফার নির্বাচন শেষ হবার অব্যবহিত পরেই তৃতীয় ফ্রন্টের আরেক জোট সঙ্গী টি আর এস এন ডি এ শিবিরে যোগ দেওয়ায় এই ফ্রন্ট মরীচিকার ভাঙ্গন শুরু হয়েছিল তখনই। ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হবার পর তা তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়েছে। এরই মধ্যে বোমা ফাটিয়েছেন

(এরপর ৪ পাতায়)

রাজ্যের ৪২টি আসন যাদের দখলে

কেন্দ্র	জয়ী প্রার্থী	জয়ী দল
কলকাতা দক্ষিণ	মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়	তৃণমূল কংগ্রেস
কলকাতা উত্তর	সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
হাওড়া	অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
উলুবেড়িয়া	সুলতান আহমেদ	ঐ
শ্রীরামপুর	কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
বারাসাত	কাকলি ঘোষ দস্তিদার	ঐ
দমদম	সৌগত রায়	ঐ
হুগলি	রত্না দে নাগ	ঐ
রাণাঘাট (তফঃ)	সুচারু হালদার	ঐ
যাদবপুর	কবীর সুমন	ঐ
ডায়মন্ডহারবার	সোমেন মিত্র	ঐ
বসিরহাট	হাজি-নুরুল ইসালম	ঐ
কৃষ্ণনগর	তাপস পাল	ঐ
কাঁথি	শিশির অধিকারী	ঐ
ব্যারাকপুর	দীনেশ ত্রিবেদী	ঐ
তমলুক	শুভেন্দু অধিকারী	ঐ
বনগাঁ	গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর	ঐ
মেদিনীপুর	প্রবোধ পান্ডা	সিপিআই
পুরুলিয়া	নরহরি মাহাতো	ফরওয়ার্ড ব্লক
বাঁকুড়া	বাসুদেব আচারিয়া	সিপিএম
বীরভূম	শতাব্দী রায়	তৃণমূল
বোলপুর (তফঃ)	রামচন্দ্র ডোম	সিপিএম
বর্ধমান-দুর্গাপুর	সাইদুল হক	সিপিএম
আসানসোল	বংশগোপাল চৌধুরী	সিপিএম
ঝাড়গ্রাম (তঃ উঃ)	পুলিনবিহারী বাস্কে	সিপিএম
ঘাটাল	গুরুদাস দাশগুপ্ত	সি পি আই
মুর্শিদাবাদ	মান্নান হোসেন	কংগ্রেস
বহরমপুর	অধীর চৌধুরী	কংগ্রেস
জঙ্গিপুর	প্রণব মুখোপাধ্যায়	কংগ্রেস
মালদহ উত্তর	মৌসম বেনজির নূর	কংগ্রেস
মালদহ দক্ষিণ	আবু হোসেন খান চৌধুরী	কংগ্রেস
বালুরঘাট	প্রশান্ত মজুমদার	আর এস পি
আরামবাগ (তফঃ)	শক্তিমোহন মালিক	সিপিএম
বিষ্ণুপুর	সুস্মিতা বাউড়ি	সিপিআই (এম)
মথুরাপুর (তফঃ)	চৌধুরীমোহন জাটুয়া	তৃণমূল কংগ্রেস
আলিপুরদুয়ার (তঃ উঃ)	মনোহর তিরকে	আর এস পি
কোচবিহার	নৃপেন রায়	ফরওয়ার্ড ব্লক
জলপাইগুড়ি (তফঃ)	মহেন্দ্র রায়	সিপিএম
রায়গঞ্জ	দীপা দাশমুন্সি	কংগ্রেস
দার্জিলিং	যশবন্ত সিংহ	বিজেপি
জয়নগর (তফঃ)	তরুণ মন্ডল	এস ইউ সি আই
বর্ধমান পূর্ব (তফঃ)	অনুপ সাহা	সি পি এম

লোকসভার ৫৪৩টি আসনের রূপরেখা

ইউ পি এ - ২৬১

কংগ্রেস - ২০৬, তৃণমূল কংগ্রেস - ১৯, ডি এম কে - ১৮, এন সি পি - ৯, এন সি - ৩, জে এম এম - ২, মুসলিম লীগ - ২, ভি সি কে - ১, কেরল কংগ্রেস - ১।

এন ডি এ - ১৫৯

বিজেপি - ১১৬, জে ডি ইউ - ২০, শিবসেনা - ১১, অগপ - ১, অকালি দল - ৪, রাষ্ট্রীয় লোক দল - ৫, টি আর এস - ২।

তৃতীয় মোর্চা - ৭৭

বামফ্রন্ট - ২৪ (সি পি এম - ১৬, সি পি আই - ৪, আর এস পি - ২, ফরওয়ার্ড ব্লক - ২) বি এস পি - ২১, বি জে ডি - ১৪, এ আই এ ডি এম কে - ৯, টি ডি পি - ৬, জে ডি এস - ৩।

চতুর্থ মোর্চা - ২৭

সমাজবাদী পার্টি - ২৩, রাষ্ট্রীয় জনতা দল - ৪।

অন্যান্য - ১৯।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

লড়াইয়ে হার, যুদ্ধে নয়

নির্বাচনে জয়-পরাজয় আছেই। এইবার জনাদেশ কংগ্রেসের পক্ষেই গিয়াছে। বিস্ময়করভাবে কংগ্রেস বিপুল ভোটে জয়ী হইয়াছে। কিন্তু জনাদেশের ফলাফল খুটাইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, শুধুমাত্র বিজেপি-র দুর্বলতার জন্য কংগ্রেস এইভাবে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে নাই। আবার নীতি ও 'পারফরম্যানস্'-এর জন্যও কংগ্রেস এই ফললাভ করিয়াছে, এমনও বলা যাইবে না। যেমন কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস যে নিজেদের আসন বৃদ্ধি করিয়াছে, ইহার কারণ সম্পূর্ণ আলাদা। কেরলে বামপন্থীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব এতটাই জটিল আকার ধারণ করিয়াছে যে তাহা আজ প্রকাশ্যে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেরলে ক্যাডাররা পরস্পরের প্রতি এতটাই বিদ্বেষ ভাবাপন্ন যে, তাহারা কোনও রকমেই সংগঠিত হইয়া কাজ করিতে প্রস্তুত নয়। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে শাসক দল সিপিএমের বিরুদ্ধে বিবিধ কারণে জনরোষ এতটাই তুঙ্গে উঠিয়াছে যে তাহা সিপিএমকে প্রায় উৎখাত করিয়া দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে দশটি জেলায় সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট একটি আসনেও জয়লাভ করিতে পারে নাই। বিধানসভা কেন্দ্রের নিরীখে বিচার করিলে দেখা যাইবে ১৯০টি-রও বেশি কেন্দ্রে সিপিএম পর্যুদস্ত হইয়াছে। আর ইহার ফলে কংগ্রেস তৃণমূল জোট ব্যাপক জয়ের আস্বাদ পাইয়াছে। গতবারে তৃণমূলের যেখানে ছিল মাত্র একটি আসন এখন সেখানে উনিশটি আসন অর্থাৎ তৃণমূল-কংগ্রেস জোট এইবার পঁচিশটি আসনে জয়লাভ করিয়াছে।

যে সকল রাজ্যে বিজেপি-কংগ্রেসের কাছে আসন হারাইয়াছে, তাহার জন্য অনেকাংশেই নিজেদের দলীয় অন্তর্ঘাতই দায়ী। ইহা আজ আর গোপন নহে যে মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি কেন্দ্রে দলের একাংশই দলীয় প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছে। যে কারণে রাজস্থানে গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পরাজিত হইয়াছিল, এইবারও সেই কারণ বর্তমান। উত্তরাখণ্ডে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব এতটাই প্রবল যে সেই রাজ্যে বিজেপি একটি আসনেও জয়লাভ করিতে পারে নাই। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে বিজেপি উধমপুর এবং জম্মু — এই দুই কেন্দ্রেই জয়লাভ করিতে সমর্থ হইত, যদি দলের স্থানীয় শাখা প্রার্থীদের 'বহিরাগত' বলিয়া পরিত্যক্ত না করিত। মহারাষ্ট্রে বিজেপি রাজ থ্যাকারে-র এম এন এস দলের শক্তি সম্পর্কে সঠিকভাবে ধারণা করিয়া উঠিতে পারে নাই। ফলে মুম্বাই শহরে যেসব কেন্দ্রে জয়লাভের সম্ভাবনা ছিল, সেখানে পরাজিত হইয়াছে। বিজেপি-র এই দুর্বলতার সুযোগ কংগ্রেস পুরো মাত্রায় লাভ করিয়াছে। উত্তরপ্রদেশে বিজেপি স্পষ্টতই ভোটারদের নাড়ি বুঝিতে ব্যর্থ হইয়াছে। উচ্চবর্ণ ও হরিজন ভোটও যে কংগ্রেসের দিকে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে, বিজেপি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। বরং কংগ্রেসের শক্তি সম্পর্কে তাচ্ছিল্যভাবই কংগ্রেসের ঝুলিতে কয়েকটি অতিরিক্ত আসন ভরিয়া দিতে সাহায্য করিয়াছে। পরিণামে কংগ্রেসের মোট আসনের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে।

একথা ঠিক যে কংগ্রেসের এই পুনরুত্থানের পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা লইয়াছে মুসলিম ভোট। তবে রাজ্যে রাজ্যে ফলাফল খতাইয়া দেখিলে বোঝা যাইতেছে, যে রাজ্যে দলের ফল ভালো হইয়াছে, তাহার কারণ ভালো কাজ বা উন্নয়ণ। গোটা দেশে কংগ্রেস ঝড় বহিয়া গিয়াছে এমন নহে। বরং যেখানে যে সরকার মোটামুটি উন্নয়ণ প্রক্রিয়া বজায় রাখিয়া মানুষকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছে, তাহারাই জনগণেশের আশীর্বাদ পাইয়াছে। এজন্যই তথাকথিত কংগ্রেস ঝড়ের মধ্যেই গুজরাট, ছত্তিশগড়, বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, হিমাচল প্রদেশে অকংগ্রেসি দলগুলি কংগ্রেসকে পিছনে ফেলিয়া দিয়াছে।

তবে একটা কথা বলিতেই হয়, ভোট দেওয়ার প্রবণতা যদি কোনও ইঙ্গিত দিয়া থাকে তাহা হইলে দুঃখের সঙ্গেই বলিতে হয়, ভারতীয় মধ্যবিত্ত ভোটাররা কোনও নৈতিক বোধের দ্বারা পরিচালিত হয় নাই। দুর্নীতি এই নির্বাচনে কেন ইস্যু হইয়া উঠে নাই, তাহার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া দুষ্কর। যাহারা ভারতের কোটি কোটি টাকা লুটিয়া লইয়া গিয়াছে, কংগ্রেস সরকার যেরকম নির্লজ্জভাবে তাহাদের অভিযোগ হইতে মুক্তি দিয়াছে, ফিরাইয়া আনিবার ক্ষেত্রে যেরকম উন্নাসিকতার পরিচয় দিয়াছে, সেই বিষয়টিও কোনও নাড়া দেয় নাই। এরকমই বিস্ময়কর বিষয় হইল, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার জাতীয় অর্থনীতির অপব্যবহার ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যেরকম শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে, মধ্যবিত্ত সমাজ সেই দিকগুলিকে এড়াইয়া যাইতেই পছন্দ করিয়াছে। উদ্বেগের বিষয় হইলেও সত্য, দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও সন্ত্রাসবাদ — যাহা মধ্যবিত্ত সমাজকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া ভাবা হইয়াছিল, জনাদেশে তাহার কোনও প্রতিফলন ঘটে নাই।

এতসবের পরেও বলিতে হয়, জাতীয় স্তরে বিজেপি-ই কংগ্রেসের একমাত্র বিকল্প এবং শুধু তাই নয়, জাতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলগুলি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদের দর কষাকষির বিষয়টিও মূল্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। বিজেপি-র প্রাপ্ত আসন সংখ্যা উপেক্ষণীয় নয়। বিরোধী আসনে বসা কোনও লজ্জার বিষয় নয়। পরবর্তী লড়াইয়ের জন্য এখন হইতেই প্রস্তুতি শুরু করিতে হইবে। নির্বাচন আসিবে এবং যাইবে, দল কিন্তু থাকিবে। বিজেপি নেতৃত্ব এই অন্তবর্তীকালের মধ্যে নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি খতাইয়া দেখিবেন, সাংগঠনিক শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিবেন এবং সমর্থকদের মধ্যে আশার আলো জ্বালাইবেন — ইহাই প্রত্যাশা। কেননা রাজনীতিতে শেষ বলিয়া কোনও কথা নাই। একটি লড়াইতে হার হইয়াছে বটে, কিন্তু যুদ্ধে নয়।

শ্রীলঙ্কার জাতিদাঙ্গা
চার্চের ভূমিকা সন্দেহজনক

বাসুদেব পাল

শ্রীলঙ্কার তামিলদের জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবির প্রথম প্রবক্তা ছিলেন একজন খৃস্টান। নাম--স্যামুয়েল জেমস ভেলুপিল্লাই চেলভান্যকম্। তিনি ডাক দিয়েছিলেন 'বৃহত্তর দ্রাবিড়নাড়ু'র। তার প্রস্তাবিত দ্রাবিড়নাড়ু এলাকায় পক্প্রণালীর উভয় দিকের তামিল অধ্যুষিত অঞ্চলকে ধরা হয়েছিল। সোজাভাষায় বলা যেতে পারে বিচ্ছিন্নতাবাদী এল টি টি ই-রা তারই পদাঙ্ককে পরবর্তীকালে অনুসরণ করেছে মাত্র। এই দাবির পিছনে রয়েছে চার্চের পুরো সমর্থন। সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে দ্বীপরাষ্ট্রে শ্রীলঙ্কার প্রথম জাতিদাঙ্গার ঘটনা ঘটেছিল ১৯৮৩ সালে। পরবর্তীকালে যিনি এল টি টি ই-র রাজনৈতিক শাখার নেতৃত্ব দেন সেই অ্যান্টনি বালসিংহম্ও ছিলেন রোমান ক্যাথলিক খৃস্টান। এবং এল টি টি ই-র প্রয়াত প্রধান ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণও খৃস্টান।

মৃত প্রভাকরণের পুত্র চার্লস অ্যান্টনি।

ফাদার গ্যাসপার

অথচ ঘটনা হল, শ্রীলঙ্কার তামিলদের শতকরা ৮৫ ভাগই হল হিন্দু। তা সত্ত্বেও নেতৃত্বে খৃস্টানদের আসার অন্যতম কারণ হল চার্চের ম্যাকাইভেলিয়ান পদ্ধতি। তামিল হিন্দুদেরকে খৃস্টান নেতৃত্বকে স্বীকার করে নিতে হয়েছে----এটা এক তিক্ত বাস্তব। যদিও শ্রীলঙ্কার তামিল হিন্দুদের এক গৌরবময় উজ্জ্বল পরম্পরার ঐতিহ্য ও ইতিহাস রয়েছে। সেখানে ছিলেন অরুমুগা নবলার, পুনমবলম্ রামনাথন, পুনমবলম্ অরুণাচলম্ এবং কুমারস্বামীর মতো শৈব তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত। এঁদের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধরা ওই সকল মনীষীদের গভীর সম্মান প্রদর্শন করেন। শ্রীলঙ্কায় পুনমবলম্ রামনাথনের উদ্যোগেই বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল।

এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, চার্চের ঢুকে পড়ার কারণ কি? এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, খৃস্টান চার্চের নীতিই হল অশ্বেতকায় ও অসেমেটিকদের মধ্যে সেবা বা অন্য যে কোনও মাধ্যমে অনুপ্রবেশ করা। তাদের পুরনো সভ্যতা-সংস্কৃতিকে ভুলিয়ে দিয়ে সারা দেশকে খৃস্টানীকরণ করাই লক্ষ্য। পরে ধর্মান্তরিত খৃস্টানদের সঙ্গে অন্যদের একটা ফারাক গড়ে তুলে বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা পুষ্ট করা। শ্রীলঙ্কায় সিংহলী তামিলদের মধ্যে চার্চ এই কাজ করে চলেছে। খোদ তামিলনাড়ুর জনগণকে আর্য ও দ্রাবিড়---এই দুভাগে ভাগ করে অব্রাহ্মণদেরকে হিন্দুসমাজ থেকে পৃথক করা হয়েছে। শ্রীলঙ্কার তামিলদের ভাষার ভিত্তিতেও বিভক্ত করা হয়েছে। একদিকে এল টি টি ই-কে সরকারের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়া এবং অন্যদিকে সিংহলি-খৃস্টানদের মাধ্যমে সরকারকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে।

২০০৩ সালে শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ ও হিন্দু নেতারা যৌথভাবে হিন্দুত্ব বিষয়ক মন্ত্রী টি. মহেশ্বরনের মাধ্যমে একটি বিল এনে শ্রীলঙ্কায় খৃস্টানীকরণ বন্ধের উদ্যোগ নেন। দীর্ঘ ছ'মাস ধরে যৌথ সমিতি বিলের খসড়া তৈরি করে। চার্চ সরকারকে প্রভাবিত করে সেই বিলকে ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়ে দেয়।

সম্ভবত, চার্চের অনুমান ছিল শ্রীলঙ্কার সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী এবং সংখ্যালঘু হিন্দু তামিল সমাজ একত্রিত হলে বিদ্রোহ ঠান্ডা হয়ে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে। সেক্ষেত্রে খৃস্টান মিশনারীদের ভূমিকা দ্বীপরাষ্ট্রে অবান্তর হয়ে পড়বে। সেজন্য তারা কৌশলে 'মধ্যবর্তী ধর্মীয় কাউন্সিল' গঠন করে যা স্থায়ী সমাধানের পথ রুদ্ধ করে দেয়। এই তথাকথিত 'মধ্যবর্তী ধর্মীয় কাউন্সিলে'র কাজই হল ধর্মান্তরকরণ আইনি পথে বন্ধ করার ব্যবস্থাকে রুখে দেওয়ার এক খৃস্টান কৌশল। অখৃস্টান দেশগুলিতে এই কৌশল গ্রহণ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭৭ সালে জনতা পার্টির আমলে ভারতে জনসঙ্ঘের সাংসদ ওমপ্রকাশ ত্যাগী ব্যক্তিগত উদ্যোগে ধর্মান্তরকরণ নিষিদ্ধ করার বিষয়ে বিল আনলে তাকে রুখে দেওয়া হয়েছিল। তখন তথাকথিত সেক্যুলার খৃস্টান নেতারা পথে নেমেছিলেন। যদিও শ্রীলঙ্কায় অল সিলোন হিন্দু কংগ্রেস (এল টি টি ই-সমর্থক), হিন্দু কাউন্সিল অফ শ্রীলঙ্কা এবং ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ বুদ্ধিস্ট ক্লার্জি প্রভৃতি সংগঠনই ধর্মান্তরকরণের তীব্র বিরোধী। তা সত্ত্বেও চার্চ রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে 'অ্যান্টি কনভারসন ল' পাস করা বন্ধ করে দেয়।

রণিল বিক্রমসিঙ্ঘের ক্যাবিনেটে হিন্দু অ্যাফেয়ার মিনিস্টার ছিলেন টি. মহেশ্বরন্। ২০০৮-এর ১ জানুয়ারি এক শিবমন্দিরে প্রার্থনারত অবস্থায় তাঁকে হত্যা করা হয়। এক বছর কেটে গেলেও সরকার কেন এই হত্যার তদন্ত সম্পূর্ণ করে উঠতে পারেনি, তা রহস্যজনক। শ্রীলঙ্কা সরকারের এক মন্ত্রী ডগলাস দেবানন্দের অদৃশ্য আঙ্গুলি হেলনেই মহেশ্বরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা লঘু করা হয়েছিল। রণিল বিক্রমসিঙ্ঘের হত্যাকাণ্ডেও ডগলাসের হাত আছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। বিক্রমসিঙ্ঘে হত্যাকাণ্ড বিষয়ে বিবিসি'র ওয়েবসাইট BBC Sinhala.com-এর বর্ণনা ছিল এরকম----সন্দেহভাজন এক হত্যাকারীর রক্তের ডি এন এ-এর সঙ্গে হত্যায় ব্যবহৃত বন্দুক ব্যবহারকারীর (তাকে নিরাপত্তারক্ষীরা হত্যা করেছিল) রক্তের মিল রয়েছে। হত্যাকারীর নাম ছিল জনসন কলিন বসন্তন ভ্যালেন্টাইন।

শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ সিংহলী এবং হিন্দু তামিলদের পারস্পরিক সম্প্রীতির ইতিহাস অনেক প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। উভয়ে একত্রভাবে ধর্মান্তরকরণ নিষিদ্ধ এবং যৌথভাবে বর্তমান সমস্যার সমাধান করার প্রয়াস এর অন্যতম প্রমাণ।

ভারতের সংসদীয় নির্বাচনে তামিলনাড়ুর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শ্রীলঙ্কার তামিল সমস্যাকে গুরুত্ব নিয়ে নির্বাচনী ফায়দা তোলার চেষ্টা করেছে। প্রত্যেক দলই তামিল ভাবাবেগকে কাজে লাগানোয় উদ্যোগী ছিল। যুদ্ধ বিরতি করে প্রভাকরণকে বাঁচানোর প্রয়াস চলেছে।

একটি শক্তিশালী জোট বা ঘোঁট পাকানো হয়েছে। সেখানে আছেন বির্তকিত মিশনারী ফাদার জগৎ গ্যাসপার রাজ এবং ডি এম কে সুপ্রীমো করুণানিধির কন্যা তথা সাংসদ কানিমোঝি। তারা 'চেন্নাই সঙ্গমম্'-এর ব্যানারে নানারকম উদ্ভট নাটক করে বেড়াচ্ছেন।

২০০৭-এ 'জয়া টিভি' এ ব্যাপারে এক তদন্ত রিপোর্ট তৈরিতে নামে। এ আই এ ডি এম-কে প্রধান জে. জয়ললিতা ওই সংস্থার সঙ্গে রাজ্য সরকারের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে বলে বিবৃতি দেন। তবে গতবছর জয়ললিতা এবং তার নিজস্ব বৈদ্যুতিন মাধ্যম 'জয়া টিভি' 'চেন্নাই সঙ্গমম্'-এর উৎসব থেকে কৌশলী দূরত্ব বজায় রাখেন।

সম্প্রতি অনেক জাতীয় বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ফাদার গ্যাসপার রাজকে শ্রীলঙ্কার তামিলদের প্রতিনিধি বলে উপস্থাপিত করা হয়েছে। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বিভিন্ন বিতর্ক অনুষ্ঠানে ফাদার রাজ অন্ধভাবে এল টি টি ই-কে সমর্থন করেছেন একজন মানবাধিকার কর্মী হিসেবে। একবার তো তিনি ভারত সরকারের ভূমিকারও তীব্র সমালোচনা করেন। বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা সুব্রামনিয়াম স্বামীকে রাজাপক্ষের মাইনে করা এজেন্ট বলেও মন্তব্য করেন। তবে এখনও স্পষ্ট নয়, শ্রীলঙ্কার উৎখাত হওয়া তামিল উদ্বাস্তুরা ভারতের নাগরিক কিনা! তবে ফাদার গ্যাসপার রাজের ভূমিকার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন।

অসমে রাজ্য-রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠছে মুসলিমরা

অমল গুপ্ত, গুয়াহাটি ।। এ ইউ ডি এফ-এর উত্থানই হোক, কিংবা আজমলের 'ক্যারিশমা' — সংখ্যালঘু মুসলিমরা এখন রাজ্য-রাজনীতিতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। সংখ্যালঘু রাজনীতিও খুঁজে পেয়েছে নতুন দিক। তবে এই গুরুত্ব বৃদ্ধি র পেছনে শুধু রাজনীতিই একমাত্র কারণ নয়। বরং মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও এক বড়সড় কারণ।

জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে বলে রাজনীতিতে ক্রমশ আধিপত্য বিস্তারে সহায়ক হচ্ছে মুসলিমরা। পরিস্থিতি এমনই যে এবারের লোকসভা নির্বাচনে অন্তত পাঁচটি আসনে ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর লোকই নির্ণায়কের ভূমিকায় রয়েছেন। বিধানসভায় অন্তত ৪০টি আসনে এখন মুসলিম জনগোষ্ঠীই সংখ্যাগুরু। রাজ্য বিধানসভায় বর্তমানে ২৫ জন মুসলিম বিধায়ক রয়েছেন। কিন্তু বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোটের অনুপাতে অতি দ্রুত সেই সংখ্যা বাড়তে চলেছে। তাই অচিরেই মুসলিম জনগোষ্ঠীর লোকই হয়ে উঠছেন রাজ্যের রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রক।

গোলাম ওসমানি, আব্দুল জববার, শহিদুল ইসলাম, রশিদুল হক, মোক্তার হোসেনরা অসমের সংখ্যালঘু রাজনীতিতে যে নতুন ধারা নিয়ে এসেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বরং কংগ্রেসকেই শেষ আশ্রয় হিসাবে বেছে নেন এঁদের অনেকেই। এ-নিয়ে আজও ক্ষোভ রয়েছে মুসলিম সচেতন মহলে, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। কিন্তু ২০০৬ সালে এসে রাজ্যে নতুন করে সংখ্যালঘু রাজনীতির সূচনা করেছেন বদরুদ্দিন আজমল। অবশ্য সংখ্যালঘু নয়, আরও খুলে বলতে গেলে মুসলিম-রাজনীতির রাস্তাই প্রশস্ত করে দিয়েছেন তিনি। কংগ্রেস বিরোধী সেই রাজনীতিতে মুসলিমরাই আসলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

রাজনীতিতে মুসলিমদের দ্রুত উত্থানে এই গুরুত্ব আরও বাড়ছে। লোকসভা কিংবা বিধানসভা নির্বাচন — মুসলিমরা এখন এক বড় শক্তি। কালিয়াবর, ধুবড়ি, বরপেটা, শিলচর, করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে মুসলিম ভোটের বেশিরভাগ যে দিকে ঢলবে সেই প্রার্থীর জয় মোটামুটি নিশ্চিত। মুসলিম

বদরুদ্দিন আজমল

ভোটের উপরও প্রার্থীর জয়-পরাজয়। বিধানসভায় এই চিত্র আরও প্রকট। অন্তত ৪০টি বিধানসভা কেন্দ্রে মুসলিম জনগোষ্ঠীর লোকই এখন সংখ্যাগুরু। ফলে ওই কেন্দ্রগুলিতে সচেতনভাবে মুসলিম ভোট জোটবদ্ধ হলে আগামীতে শুধু মুসলিম জনগোষ্ঠীর লোকই বিধায়ক হতে পারবেন।

করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের অধীন পাথারকান্দি, উত্তর করিমগঞ্জ, দক্ষিণ করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, বদরপুর, আলগাপুর, কাটলিছড়া;শিলচর লোকসভা কেন্দ্রের অধীন সোনাই, উধারবন্দ, লক্ষ্মীপুর, বড়খলা, কাটিগড়া; ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রের অধীন মানকাচর, দক্ষিণ শালমারা, ধুবড়ি, গোলকগঞ্জ, পশ্চিম বিলাসিপাড়া, পূর্ব বিলাসিপাড়া, জলেশ্বর, পূর্ব গোয়ালপাড়া, পশ্চিম গোয়ালপাড়া;বরপেটা লোকসভা কেন্দ্রের অধীন উত্তর অভয়াপুরী, দক্ষিণ অভয়াপুরী, জানিয়া, বাঘবর, সরুক্ষেত্রী, চেঙা — এই বিধানসভা কেন্দ্রগুলির কোনওটিতে মুসলিমরা সংখ্যাগুরু, কোথাও নির্ণায়ক কিংবা সংখ্যাগুরু হওয়ার পথে।

একইভাবে গুয়াহাটি লোকসভা কেন্দ্রের অধীন হাজো, বরক্ষেত্রী; মঙ্গলদৈ লোকসভা কেন্দ্রের অধীন দলগাঁও, মঙ্গলদৈ;নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের অধীন লাহরিঘাট, রহা, যমুনামুখ, হোজাই;কলিয়াবর লোকসভা কেন্দ্রের অধীন ধিং, বটদ্রবা, রূপহি, সামাগুড়ি প্রভৃতি বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে মুসলিম জনগোষ্ঠীর লোকই সংখ্যায় ভারি। কোথাও প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করে দিচ্ছেন। কোথাও আবার নিজেদের প্রতিনিধিই বিধানসভায় পাঠাচ্ছেন, যেখানে ভোটের অঙ্কে মুসলিম জনগোষ্ঠীর লোক ছাড়া অন্য কোনও সম্প্রদায়ের লোকের জয়ের সম্ভাবনাই প্রায় নেই। তাই বিধানসভায় সংখ্যাবৃদ্ধি হয়ে মুসলিম জনগোষ্ঠীকেই আগামীতে রাজ্য-রাজ্যনীতিতে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় দেখা যাওয়ার অস্ফুট ছবি ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।

(সৌজন্যে - দৈনিক সংবাদ)

প্রয়াত মনোরঞ্জন ঘোষ-এর স্মরণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মানুষের মৃত্যু অমোঘ বিধান, কিন্তু তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন তখনই যথার্থ হয়, যখন তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকৃত বাস্তবায়ণ হয়। প্রয়াত মনোরঞ্জন ঘোষ-এর স্বপ্ন ও কৃতকর্মকে আরও বেশি বিস্তারের মধ্য দিয়েই তার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন হবে বলে মন্তব্য করলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী যুক্তানন্দজী মহারাজ। গত ১৪ মে দক্ষিণ ২৪ পরগণার নুঙ্গি প্রণবানন্দ শিশু মন্দিরে ঁমনোরঞ্জন ঘোষ-এর স্মরণসভায় বক্তব্য রাখতে এসে এমন মন্তব্য করেন তিনি।

সভায় স্থানীয় বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি মনোরঞ্জন ঘোষ-এর বিভিন্ন কাজ-কর্মের কথা তুলে ধরে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং ভবিষ্যতে সেই কাজই আরও বিস্তৃতভাবে করার অঙ্গিকার করেন। সভায় তাঁর স্ত্রী, পুত্র, নাতি, পুত্রবধূ প্রমুখরাও উপস্থিত থেকে তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। প্রসঙ্গত, মনোরঞ্জনবাবু তিরিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে স্বস্তিকা পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে সক্রিয় ছিলেন। স্বস্তিকার পক্ষ থেকে প্রদীপ সান্তারা স্মৃতিচারণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন।

নিরাশ্রয় স্লামডগখ্যাত ২০ শিশু

সংবাদদাতা ।। অস্কার পুরস্কার জয়ী চলচ্চিত্র স্লামডগ মিলিওনেয়ার-এ অভিনয় করেছিল কুড়িটি শিশু। এদের এখন খোলা আকাশের নীচে বসবাস করতে হচ্ছে। মুম্বাইয়ে শহর কর্তৃপক্ষ একটি বস্তির বেশ কয়েকটি ঝুপড়ি ভেঙ্গে দিলে, গৃহহীন হয়ে পরে তারা। স্লামডগ শিশুদের চরিত্র অভিনয় করা আজাহারউদ্দিন ইসমাইল শেখকে চলচ্চিত্রের মতোই লাঠি তাড়া করে পূর্ব বান্দ্রার বস্তিছাড়া করা হয় বলে প্রকাশ। আজহারউদ্দিন সংবাদসংস্থা আই এ এন এসকে জানিয়েছে, পৌর কর্তৃপক্ষ বিনা নোটিশে হঠাৎ করে বস্তি উচ্ছেদ করতে আসে। এ সময় তারা ঝুপড়িগুলোও ভেঙ্গে দেয়। দশ বছর বয়সী আজহার জানায়, আমাদের যাওয়ার কোনও জায়গা নেই। তাই প্রখর রোদের মধ্যেই রাস্তায় বসে আছি। আমাদের ব্যবহৃত অধিকাংশ জিনিসপত্র ফেলে দেওয়া হয়েছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ক্রন্দনরত আজহারউদ্দিন আরও জানায়, আমরা জানি না আজকে কি খাবো।

অবশ্য মুম্বাইয়ের পৌর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বস্তিটি অবৈধ হওয়ায় তুলে দেওয়া হয়েছে। পৌর কর্মকর্তা ইউ ডি মিস্ত্রি জানান, হতে পারে তারকা শিশুগুলোর ঝুপড়িও ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। আমাদের তো নির্দেশ পালন করতে হবে।

পৌর কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, জুনে বর্ষার আগে সম্ভব হলে উচ্ছেদকৃতদের জন্য নতুন আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। স্লামডগ মিলিওনেয়ারের অসাধারণ অভিনয়ের জন্য আজহারউদ্দিন এবং তার সহ তারকা রুবিনা আলিকে ফ্ল্যাট দেবার আশ্বাস দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অশোক চ্যবন। তবে সেই আশ্বাস এখনও বাস্তবের রূপ নেয়নি বলে দাবি আজহারের মা শামিম বেগম-এর । তিনি জানান, আমাদের যদি থাকার অন্য কোনও জায়গা থাকতো, তাহলে বস্তিতে থেকে কষ্ট করতাম কেন? আমাদের থাকার কোনও জায়গা নেই।

অপ্রাসঙ্গিক বামেরা

(২ পাতার পর)

সংসদের প্রাক্তন স্পীকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। দলের ব্যর্থতার দায় নিয়ে প্রকাশ কারাটকে সরে যাওয়ার জন্য প্রকাশ্যেই উপদেশ দিয়েছেন তিনি। প্রকাশ কারাটের হঠকারিতায় ক্ষুব্ধ পার্টির বেঙ্গল লাইনের নেতারাও তাঁকে বিদায় করতে চাইছেন। যাই হোক, গত পাঁচবছরে সাড়ে চার বছর বামেদের থাকার জন্যই হোক বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক সেভাবে সফল না হলেও এবার বিপুল ভোটে জিতে দিল্লীর ক্ষমতা দখল করছে কংগ্রেস। কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ-তে দ্বিতীয় বৃহত্তম শরিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে তৃণমূল। সুতরাং তৃণমূল কংগ্রেস ও তার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে রাজ্যবাসীর প্রত্যাশা অনেক। পাশাপাশি এই হতাশাজনক ফল কেন হল তার জন্য আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন বিজেপির। মন্দার বাজার থেকে উত্তরণের জন্য দেশবাসী যে কোনও ঝুট-ঝামেলা চাইছেন না, চাইছেন স্থায়ী সরকার তা ভোটের ফলে স্পষ্ট। আর এই চাওয়া-পাওয়ায় বামপন্থীরা ও বামপন্থা যে ব্রাত্যজনের ভূমিকায় তা দেশবাসীকে অবশ্যই স্বস্তি এনে দেবে।

বিজেপির আলোর রেখা

(১ পাতার পর)

প্রার্থীর কাছে সাড়ে সাত হাজার ভোটে হেরে গিয়েছেন।

কন্ধমাল লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি দলের প্রার্থী ছিলেন প্রাক্তন আই পি এস অশোক সাহু। তিনি তৃতীয় স্থানে এসেছেন। কন্ধমাল লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে — কন্ধমাল, বৌধ, গঞ্জাম এবং নয়াগড় জেলাতে।

কিন্তু কন্ধমাল জেলা থেকে তিনি ১.০৭ লক্ষ ভোট পেয়েছেন। সেক্ষেত্রে কংগ্রেস পেয়েছে ৬৫,০০০ এবং বি জে ডি-র প্রাপ্ত ভোট ৬৩,০০০ মাত্র। অন্যান্য জেলাতে অশোক সাহু পর্যাপ্ত পরিমাণ ভোট না পাওয়াতেই তৃতীয় স্থানে। তবে কন্ধমাল জেলাতে বিজেপির ভোটব্যাঙ্ক অটুট।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কন্ধমাল আসন বরাবর বিজেডি'র দখলে থাকলেও এবার বিজেপি-ই জয়ী হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে নিজস্ব ভোটব্যাঙ্ক অটুট বিজেপির

(১ পাতার পর)

অনেকটাই তৃণমূলের পক্ষে গেছে। ভবিষ্যতে এমনটা নাও হতে পারে। নেগেটিভ ভোটের বিপদটা এখানেই। নির্ভর করা যায় না।

বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে একটা সহজ সরল কথা এবার বুঝে নিতে হবে যে হিন্দুত্বের লাইন থেকে সরে এলে জনসমর্থন হারাতে হবে। ভারতে হিন্দুরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত নয়। আর তা নয় বলেই নিজের দেশের মাটিতেই তারা আক্রান্ত। মুসলিম, খৃস্টানরা দলবদ্ধ বলেই অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীরা তাঁদের তোয়াজ করে চলেন। বরুণ গান্ধীকে অন্যায় অনৈতিকভাবে জাতীয় সুরক্ষা আইনে বিনা বিচারে জেলে পুরলে ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতার ধবজাধারী মিডিয়া সোরগোল তোলে না। সুপ্রিম কোর্টের কড়া মন্তব্য ও রায়ের পরেও পিলভিটের জেলাশাসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। জাতীয় সুরক্ষা আইনকে দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষায় ও প্রতিহিংসা নিতে ব্যবহার করার জন্য উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতীকে শাস্তি পেতে হয় না। কারণ একটাই। ভোট পেতে মুসলিম তোষণ নীতি। মুসলিম, খৃস্টানরা যদি দলবদ্ধ হয় তবে হিন্দুরা কেন হবে না? হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার দায় নেবে কে? এই দায় বিজেপিকেই নিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে শত তোয়াজ করলেও মুসলিম ও খৃস্টান ভোট বিজেপি-র বাক্সে পড়বে না। হিন্দু সমর্থনই বিজেপিকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবে।

রাজ্য নির্বাচন আধিকারিক যেন পলিটব্যুরো সদস্য

নবকুমার ভট্টাচার্য

এরাজ্যে পঞ্চ দশ সাধারণ নির্বাচনের সবকটি পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। যা আশঙ্কা ছিল তাই ঘটেছে। নির্বাচন কি সুষ্ঠু হয়েছে? পশ্চিমবঙ্গে যে গত কয়েক দশক ধরে অবাধ নির্বাচন করা সম্ভব হচ্ছে না, সেই অভিজ্ঞতা আমাদের প্রায় সকলেরই। ২০০৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে সরকার প্রশাসন ও শাসকদলের ভূমিকা দেখে কমিশনের আধিকারিক আফজল আমানুল্লা নির্বাচন কমিশনকে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাতে বলা হয়েছে — এরাজ্যে সুষ্ঠু নির্বাচন হয় না। সম্প্রতি প্রকাশিত প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি এন কৃষ্ণমূর্তি তাঁর আত্মজীবনীতে পশ্চিমবঙ্গে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার কাজে সি পি এম দল এবং তার সরকারের মুখ্য পরিচালক ও আমলারা যে বাধার সৃষ্টি করে, সে সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলেছেন। এবারের নির্বাচনের দিনগুলিতেও গণমুক্তি পরিষদ, টাসাম, ফামা, ফোরাম অব ফ্রি থিংকার্স, চেতনা প্রভৃতি সংস্থার সদস্যরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন নির্বাচন কমিশনে দলীয় তাঁবেদারের অনুপ্রবেশে কীভাবে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নির্বাচনের দুটি পর্ব প্রত্যক্ষ করে মনে হয়েছে, সিপিএমের

দেবাশিস সেন

দল দাসত্ব করে আখের গোছানো নির্বাচন আধিকারিকের পক্ষে সুষ্ঠু সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। তা যে সম্ভব নয় তার প্রমাণ প্রতি পদে পদে মিলেছে। গণমুক্তি পরিষদের সভাপতি সুনন্দ সান্যাল ছাপার অক্ষরে জানাতে বাধ্য হয়েছেন — দেবাশিস বাবু, আপনার প্রতি আস্থা নেই। আপনি নিরপেক্ষ নন। আপনি সিপিএমের পক্ষে। তাই আপনি বামফ্রন্ট প্রার্থীদের পক্ষে ভোট জালিয়াতি বরদাস্ত করেছেন।' ব্যারাকপুর, বারাসত, যাদবপুর ঘুরে আমাদের সকলেরই ধারনা হয়েছে,মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক অনেক সময় চোখে ঠুলি দিয়ে থেকেছেন। অথচ মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে জনসাধারণকে সুষ্ঠুভাবে ভোট দিতে দেওয়ার অধিকার দেওয়া। সে দায়িত্ব তিনি পালন করতে পারেননি, মনে হয় তা তিনি চানওনি। তিনি চাইলেই কেশপুর, গড়বেতা, খেজুরী, ভগবানপুর, গারুলিয়াতে ছাপ্পা ভোট বন্ধ করতে পারতেন। মেদিনীপুর আসনে প্রায় আশি হাজার ভূয়ো ভোটারের তালিকা নির্বাচনের প্রায় একমাস আগে তৃণমূল প্রার্থী দীপক ঘোষ মেদিনীপুরের রিটার্নিং অফিসার ও জেলাশাসক নারায়ণস্বরূপ নিগমের কাছে তথ্যপ্রমাণ দিয়ে তাঁর অভিযোগ পেশ করলেও তাঁর প্রতি কোনও দৃকপাত না করে চরম কারচুপি ও জোচ্চুরিতে ভরা ভোটার তালিকার ভিত্তিতে মেদিনীপুর আসনে ভোট করিয়েছেন রাজ্য নির্বাচন আধিকারিক। যে সমস্ত পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে শাসক দলের হয়ে খোলাখুলি কাজ করার এবং যাদের বিরুদ্ধে বিরূপ রিপোর্ট আছে তাদের ওপরও অদৃশ্য কারণে দায়িত্ব অর্পণ করা

(এরপর ১৩ পাতায়)

ইসলামপুর পুরসভার ভোট নিয়ে জোর রাজনৈতিক তৎপরতা

মহাবীর প্রসাদ টোডি ।। লোকসভা ভোট শেষ হতে না হতেই, ইসলামপুরে পুরভোট নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। আগামী ২৮ জুন (২০০৯) ১৭টি ওয়ার্ড নিয়ে ইসলামপুরে পুরভোট হতে চলেছে। এতদিন ইসলামপুর পুরসভার মোট ১৪টি ওয়ার্ড ছিল। পুনর্বিন্যাসের পর ইসলামপুর পুরসভার আরও তিনটি ওয়ার্ড বেড়েছে। নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী, শহরের তিনটি বড় ওয়ার্ডকে ভাঙা হয়েছে। সেগুলি ১, ২ এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডগুলিকে ভেঙ্গে তিনটি নতুন ওয়ার্ড গঠিত হয়েছে।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি কমিশন পুরবোর্ডের পাঠানো নতুন রোস্টারকে চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে। নতুন রোস্টার অনুযায়ী ১ নম্বর ওয়ার্ডকে ভেঙ্গে ১ নম্বর এবং ২ নম্বর ওয়ার্ড করা হয়েছে। ২ নম্বর ওয়ার্ডকে ভেঙ্গে করা হয়েছে ৩ এবং ৬ নম্বর ওয়ার্ড। ৯ নম্বর ওয়ার্ডকে ভেঙ্গে ১৬ এবং ১৭ নম্বর ওয়ার্ড করা হয়েছে। এর ফলে পুরানো ওয়ার্ডগুলির নম্বরও পরিবর্তিত হয়েছে। এবং নতুন রোস্টার অনুযায়ী মহিলা ও তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত ওয়ার্ডগুলিরও হেরফের ঘটেছে। নতুন হিসাব নিম্নের তালিকা অনুযায়ী হবে। (সারণী দ্রষ্টব্য)

পুরসভার চেয়ারম্যান কংগ্রেসের কানাইয়ালাল আগরওয়ালা বলেন, কমিশনের প্রস্তাব মেনে নিয়ম অনুযায়ী সব কিছু চূড়ান্ত করা হয়েছে। ওয়ার্ডের সংখ্যা বাড়ায় পুরসভার বরাদ্দও বাড়বে।

পূর্বের ওয়ার্ডগুলি	পরিবর্তিত ওয়ার্ডগুলি	ওয়ার্ড নং	পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রার্থী
১	১ ও ২	১	জেনারেল মহিলা
২	৩ ও ৬	২	জেনারেল
৩	৪	৩	জেনারেল মহিলা
৪	৫	৪	জেনারেল
৫	১৩	৫	জেনারেল
৬	১২	৬	তফসিলি জাতি
৭	১৪	৭	জেনারেল মহিলা
৮	১৫	৮	জেনারেল
৯	১৬ ও ১৭	৯	জেনারেল
১০	১১	১০	মহিলা
১১	১০	১১	তফসিলি জাতি
১২	৭	১২	জেনারেল
১৩	৯	১৩	জেনারেল
১৪	৮	১৪	মহিলা
পূর্বে ১৪	বর্তমানে	১৫	তপসিলি মহিলা
মোট	মোট ১৭	১৬	জেনারেল
১৪ ওয়ার্ড	——	১৭	জেনারেল

অ ফে রকম

স্বপ্নের সঞ্চয়

সামনে গ্রাহকদের ভিড়। সকলেই দাঁড়িয়ে আছে — তাদের টাকা জমা করতে। কারও হাতে পঞ্চাশ। কারও আবার দেড়-দুশো টাকা। যা বয়সের তুলনায় অনেক। ওদের সকলেরই বয়স ১০ থেকে ১২-র মধ্যে। ওদের কেউ কাজ করে পরের বাড়িতে। কেউ বা অন্য কোথাও। তবে সম্পাদিত। বড়দের এখানে ঠাঁই নেই। খাজনা ব্যাঙ্কের রূপাদাতা একটি এনজিও। 'বাটার ফ্রাই' এনজিও-র হাত ধরেই ২০০১-এ গড়ে ওঠে এই ব্যাঙ্ক। তবে খাজানা ব্যাঙ্ক কোনও চালচুলোহীন ব্যাঙ্ক নয়। ব্যাঙ্কে সব গণিতই এখানে মেনে চলে হয়। মেনে চলা হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশিকাও। পথের কচিকাচাদের জন্য গড়ে তোলা হয় খাজনা ব্যাঙ্ক। যাতে তারা তাদের উপার্জনের টাকা সঠিক কাজে লাগাতে পারে। সমাজের নকল পদ্ধতি চালু। 'সেভিং একাউন্ট' ও 'চলতে-ফিরতে' একাউন্ট। এই দুই সঞ্চয় পদ্ধতিতে বাচ্চারা টাকা জমা রাখতে পারে। প্রয়োজনে তারা যেমন টাকা তুলতে পারে, তেমনি ব্যাঙ্ক থেকে ঋণও পায়। নিজেদের জন্মদিন বা ডাক্তার দেখানোর জন্য টাকার প্রয়োজন হলে, অনায়াসে খাজানা থেকে লোন পাওয়া যায়।

খাজনা ব্যাঙ্ক সন্ধ্যের দিকে দু'ঘন্টার জন্য খোলা থাকে, টাকা তোলার জন্য।

ব্যাঙ্কে তাদের টাকা জমা করছে কচিকাচারা। পাশে পানিক্কর রীতা।

সবার হাতেই রয়েছে কিছু না কিছু টাকা। নিজেদের উপার্জনের কিছু টাকা ব্যাঙ্কে জমা করতেই ভিড় জমিয়েছিল ওরা। যে টাকা জমা নিচ্ছে তার বয়সও কম। বড়জোর ১৫ বছর। ব্যাঙ্কের কোথাও কোনও ভারী বয়সের কেউ নেই। সবার বয়সই ১৫-র নীচে। একেবারে কচি-কাচা। ব্যাঙ্কের স্টাফ থেকে গ্রাহকের বয়সও হাঁটুর নীচে।

খোদ দিল্লীর বুকেই রয়েছে এমন ব্যাঙ্ক। চিল্ড্রেন ডেভলেপমেন্ট খাজানা ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কের সমস্ত কর্ম-কান্ডই বাচ্চাদের নিয়ে বৈভবের স্রোতে মিশে না যায়। এর ফলও পাচ্ছে গ্রাহকেরা। গ্রহীতাদের অনেকেরই আজ হাজার হাজার টাকা জমে উঠেছে। বাবা-মা হারা ছেলেগুলোর কাছে এই ব্যাঙ্কই ভরসা। যা তাদের হারিয়ে যেতে দেয়নি। সঞ্চয়ী করে তুলেছে।

'বাটার ফ্লাই' এনজিও-র নির্দেশক শ্রীমতী রীতা পানিক্কর মতে', বাচ্চারা যাতে তাঁদের উপার্জিত অর্থ কোনও নেশার পিছনে খরচ না করে, তার জন্যই আমাদের এই সঞ্চয়ের রাস্তা'। ব্যাঙ্কে দু' ধরনের সঞ্চয় এছাড়া দিল্লীর বুকে ১৫টি কাউন্টার রয়েছে। যেখানে গ্রাহকরা টাকা জমা করতে পারে। ব্যাঙ্কের কর্ম-কান্ড পরিচালনার জন্য ম্যানেজার নিয়োগ করা হয় মাসিক বৈঠকে। তাদের মধ্য থেকে একজন নির্বাচিত হয়। মেয়াদ কাল অবশ্য ছ'মাসের জন্য। তারপর আবার অন্য কেউ।

এভাবেই চলে সঞ্চয়। এটাই সঞ্চয়ের পরম্পরা।

সাক্ষাৎকার ঃ ভাইয়াজী (সুরেশ) যোশী

হিন্দুত্বের জাগরণই সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নব-নির্বাচিত সরকার্যবাহ সুরেশ যোশী, যিনি 'ভাইয়াজী' বলেই স্বয়ংসেবকদের কাছে বেশি পরিচিত। সরকার্যবাহ হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের পরই তাঁর একটি একান্ত সাক্ষাৎকার নেন 'পাঞ্চ জন্য' সাপ্তাহিকের প্রাক্তন সম্পাদক তরুণ বিজয়— যিনি এখন দিল্লীর ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী শোধ অধিষ্ঠান-এর ডিরেক্টর। সাক্ষাৎকারটি এখানে সম্পূর্ণ প্রকাশ করা হল। —সঃ স্বঃ

❑ ভাইয়াজী! সেবা প্রমুখ থেকে সরকার্যবাহ পর্যন্ত দায়িত্ব পাওয়াটা আপনার কেমন লাগছে এবং এটা সঙ্ঘের কোন প্রক্রিয়ার পরিণাম?

❍ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের যোজনাবদ্ধ ভাবে সেবা কাজ ১৯৮৯ সালে পূজনীয় ডাঃ হেডগেওয়ারের জন্মশতবর্ষে শুরু হয়েছে। তখন আমার ওপর মহারাষ্ট্র প্রান্তের সেবা বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ওই সময় নাসিক বিভাগ প্রচারক ছিলাম। তারপর ১৯৯০ সালে মহারাষ্ট্র প্রান্ত সেবা প্রমুখের দায়িত্ব পেলাম। আমার সৌভাগ্য যে মহারাষ্ট্রে আগে হতেই অনেক যোগ্য কার্যকর্তা সামাজিক রচনাত্মক কাজে লেগে ছিলেন। এজন্যে তাঁদের সান্নিধ্য ও অভিজ্ঞতার লাভ পাওয়ার ফলে আমার অনেক কিছু শেখার সৌভাগ্য হয়েছে। এইভাবে কাজ করতে করতে সেবা কাজেরও প্রসার হচ্ছে। আমরা তো জানি যে যেকোনও স্বয়ংসেবক শাখার মাধ্যমে সঙ্ঘে আসার পর সহজেই সব রকমের প্রাকৃতিক বিপদের মোকাবিলায় স্বাভাবিকভাবেই কাজ করেন। এর পিছনে একটাই কারণ---সমাজের প্রতি আত্মীয়তাবোধ। ওই ভাবনাকে বাড়াবার জন্য সেবা বিভাগ শুরু হল। কিন্তু আমাদের সমাজের এক বড় অংশ প্রায়ই অনেক প্রকারের সমস্যা ও অব্যবস্থার মধ্যে বেঁচে থাকেন। তাঁদের প্রতিও একই সংবেদনা নিয়ে আমাদের কাজ করা উচিত---এটা ছিল আমাদের সেবা কাজ বাড়ানোর সৈদ্ধান্তিক ভূমিকা। এটাই বুঝিয়ে আমরা কার্যকর্তাদের এই লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি।

সঙ্ঘের ব্যক্তি নির্মাণের কল্পনা হচ্ছে, ব্যক্তি পুরুষার্থী হবেন, ধ্যেয়নিষ্ঠ হবেন, সংবেদনশীল হবেন। এই দৃষ্টি ও উদ্দেশ্য নিয়ে সেবা ক্ষেত্রে সঙ্ঘের কার্যকর্তারা কাজ শুরু করেছেন। আমার সৌভাগ্য যে, এই ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। এভাবে অনেক অনুভবী ব্যক্তির মার্গদর্শন আমি পেয়েছি। এই প্রবাহে ২০০৩ সালে যখন সহ-সরকার্যবাহ হলাম তখনও এই বিষয়ের প্রতি আমার রুচি থাকার কারণে প্রবাসের সময় সঙ্ঘের নিত্য বিষয়ের সাথে সাথে এই বিষয় নিয়েও অনেক ব্যক্তি ও কার্যকর্তাদের সাথে দেখা হতো এবং এ বিষয়ে কিছু বেশি জানার জন্য অনেক প্রকার সেবা প্রশিক্ষণ বর্গেও যেতাম। সঙ্ঘ কাজে রুচি-অরুচির বিষয় থাকে না। যা দায়িত্ব দেওয়া হয় তা বুঝে দায়িত্ব পালন করা হয়। এটা আমাদের পরম্পরা। আমার ঝোঁক স্বাভাবিক ভাবে সেবাকাজে বেশি থাকা সত্ত্বেও এটা বলব না যে অন্য আর কোনও বিষয়ের চিন্তা নাই। আমাদের পূর্বতন সরসঙ্ঘচালক সুদর্শনজী তো অনেক বছর ধরে গ্রাম বিকাশ ও কৃষি বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখছেন। এর পরিণামও ভালো হয়েছে। সরকার্যবাহ হওয়ার কারণেও এখনও পর্যন্ত আমার বেশি ঝোঁক সেবা ক্ষেত্রের দিকেই আছে, কিন্তু এখন অন্য বিষয়গুলিও সামগ্রিকভাবে বিচার করার দায়িত্ব এসেছে।

❑ অর্থাৎ এখন সেবা কার্যে আপনার সময় কম পাওয়া যাবে?

❍ না, আমরা একটা পরিকল্পনা করেছি। সঙ্ঘের পরম্পরাতে কার্যকর্তা বিকশিত হতেই থাকে। সারা দেশে এরকম অনেক কার্যকর্তা আছেন যাঁরা অনেক রুচি ও অধ্যয়নপূর্বক এই কাজে লেগে আছেন। এখন এটা প্রশ্ন নয় যে, সেবা কার্য কেমন করে চলবে? এই কাজ তো নিজ গতিতে চলবে। ডাক্তারজীর জন্মশতবর্ষের সময় সেবা কার্যের সংখ্যা ৫০০০ ছিল। চিন্তা করার জন্য অনেক বড় একটা সংখ্যা সেবা ক্ষেত্রে লেগে আছেন এবং এটা বেড়েই চলেছে। কোনও এক ব্যক্তির কারণে বাড়ে না বা কমে না। এটা সঙ্ঘের পদ্ধতিও নয়।

> **"সঙ্ঘের ব্যক্তি নির্মাণের কল্পনা হচ্ছে, ব্যক্তি পুরুষার্থী হবেন, ধ্যেয়নিষ্ঠ হবেন, সংবেদনশীল হবেন। এই দৃষ্টি ও উদ্দেশ্য নিয়ে সেবা ক্ষেত্রে সঙ্ঘের কার্যকর্তারা কাজ শুরু করেছেন। আমার সৌভাগ্য যে, এই ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি।"**

স্বয়ংসেবকরা, কার্যকর্তারা সেবা বিষয়কে আন্তরিকভাবে স্বীকার করেছেন এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে অনেক বেশি গতিতে এই সেবা কাজ চলতে থাকবে।

❑ সঙ্ঘ দ্বারা প্রেরিত দেড় লক্ষ সেবা কার্য কি প্রকারের সেবা কার্য? এই কার্য কোথায় কোথায় আছে?

❍ অখিল ভারতীয় স্তরে ৬-৭টি সংস্থার সেবাকার্য এতে যুক্ত আছে। এতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, ভারত বিকাশ পরিষদ, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি, দীনদয়াল শোধ সংস্থান ও অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ সহ অনেক সংস্থা ও কার্যকর্তা সংলগ্ন আছেন। আমরা অখিল ভারতীয় সংস্থাগুলির সাথে দেশব্যাপী প্রায় ১০০০-এর বেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে নিয়ে একটি ট্রাস্ট রূপে "রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতী" নামে সংগঠন নির্মাণ করেছি। এর মধ্যে যেসব সংস্থাগুলি আছে তারা অখিল ভারতীয় সংগঠনগুলির সাথে সম্বন্ধিত নয়, রচনা অনুসারে রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতীর সাথে সংলগ্ন হয়ে কাজ করার জন্যে তৈরি হয়েছে। আমাদের সেবাকার্য চার প্রকারের। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজিক সংস্কার ও স্বাবলম্বন। এটা বলতেই হয় যে, আমাদের দেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিকটি সাধারণত উপেক্ষা করা হয়।

❑ বিদ্যাভারতীর কার্যও কি এতে যুক্ত আছে?

❍ না। কিন্তু বিদ্যাভারতী যা সেবা কার্য করে থাকে, সেটা সেবাকাজের সঙ্গে যুক্ত হয়। সাধারণত বিদ্যাভারতী যে বিদ্যালয় চালায় তাকে সেবা কার্য বলা হয় না। তারা তো সমাজের স্বাভাবিক চাহিদাকে পূর্ণ করার চেষ্টা করছে। বিদ্যাভারতীর শিক্ষকদের দ্বারা অনেক নগরে, ঝুপড়ি তে (বস্তি) গ্রামীণ এলাকায়, বনাঞ্চ লে যে একল বিদ্যালয় বা ছাত্রাবাস চলে, যা নিঃশুল্ক তা নিশ্চি তভাবেই সেবা কার্যে সামিল হয়।

❑ সঙ্ঘের প্রেরণাতে স্বয়ংসেবকদের দ্বারা দেশব্যাপী কত হাসপাতাল চলে?

❍ সারা দেশে স্বয়ংসেবকদের দ্বারা স্থাপিত সংস্থার মাধ্যমে সেবাভাব নিয়ে প্রায় ৩১টি হাসপাতাল চলছে। সেখানে ডাক্তার বন্ধুরা সমর্পিত হয়ে কাজ করছেন। কোনও হাসপাতাল কোনও ট্রাস্ট শুরু করল, আর ডাক্তারেরা কাজ করছেন - এরকম নয়। চিকিৎসকরাই মিলে সেবাভাব নিয়ে এই চিকিৎসালয়গুলি শুরু করেছেন। যেমন লাতুরে বিবেকানন্দ হাসপাতাল, সম্ভাজী নগরে (ঔরঙ্গাবাদে) হেডগেওয়ার হাসপাতাল, ভারত বিকাশ পরিষদ দ্বারা কোটাতে এক বড় হাসপাতাল। বিবেকানন্দ মেডিক্যাল মিশন দ্বারা দিল্লীতে পরিচালিত নেত্র চিকিৎসালয় এবং তার দ্বারা পরিচালিত হাসপাতাল আছে। সমাজের এরকম চাহিদাকে পূর্ণ করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনরূপে এক বড় শক্তি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কাজ করছে।

❑ আর কত ব্লাড ব্যাঙ্ক হবে?

❍ বর্তমানে দেশব্যাপী প্রায় ১৮টি ব্লাড ব্যাঙ্ক চলছে। এই পরিকল্পনা মহারাষ্ট্রেই শুরু হয়েছে। এই সময়ে ব্লাড ব্যাঙ্ক মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে বেশ ভালোভাবে চলছে।

❑ কিছুদিন পূর্বে আমার থানে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল, যেখানে ব্লাড ব্যাঙ্ক বেশ প্রভাবী কার্য করছে। তার উদ্ঘাটনও আপনিই করেছিলেন। সম্ভবত তখন আপনি সেবা প্রমুখ ছিলেন। ডাক্তারজীর জন্মশতবর্ষের সময় এই কাজ শুরু হয়েছিল কি?

❍ হ্যাঁ, ডাক্তারজীর জন্মশতবর্ষে আমরা ব্লাড ব্যাঙ্কের যোজনা শুরু করি। কিন্তু এর কিছু পূর্বেই পুনের জনকল্যাণ সমিতি ব্লাড ব্যাঙ্ক শুরু করেছিল। ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ মহারাষ্ট্রে ব্লাড ব্যাঙ্কের জাল নির্মাণ হল। বর্তমানে মহারাষ্ট্রে প্রায় ১৪-১৫টি ব্লাডব্যাঙ্ক চলছে। এ ছাড়াও তামিলনাড়ু, ব্যাঙ্গালোর এবং বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের বেরেলিতে এই কাজ শুরু করা হয়েছে। একটা মধ্যপ্রদেশের রতলামেও রয়েছে। স্থানীয় মানুষেরা একটা ট্রাস্ট তৈরি করে এগুলি চালান।

❑ থ্যালাসেমিয়া রোগী ও মানসিক দৃষ্টিতে অক্ষম বাচ্চাদের (Spastic) **জন্যও কি একটি কেন্দ্র তৈরি হয়েছে?**

❍ যে ক্ষেত্রে এরকম থ্যালাসেমিয়া রোগী পাওয়া যায়, যাকে নিরন্তর রক্ত দিতে হয়, এরকম বাচ্চা ও পরিবারকে নিঃশুল্ক রক্ত দেওয়া হয়। নাসিক, জালগাঁও ও নাগপুরে ব্লাড ব্যাঙ্কের যোজনার মধ্যে এক বিশেষ 'টিম (Team) থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত বাচ্চার জন্য গঠিত করা হয়েছে। এরকম কেন্দ্র অকোলাতেও আছে। মানসিক দৃষ্টিতে বিশেষ বাচ্চাদের জন্য

(এরপর ৭ পাতায়)

ব্রতী স্বয়ংসেবক হোন

(৬ পাতার পর)

লাতুরে সংবেদনা নামে প্রকল্প শুরু করা হয়েছে। আর একটা কথা বলা ঠিক হবে, যে রকম আমরা মানসিকরূপে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কাজ করছি, সেরকম দৃষ্টিহীনদের মধ্যে 'সক্ষম' নামক সংগঠন কাজ করছে।

❑ সক্ষম সংগঠন মূলত কি কাজ করে?

❍ এতে প্রাথমিকভাবে দৃষ্টিহীন বন্ধুদের নিয়ে কার্য শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু এখন সাথে সাথে শারীরিক রূপে অক্ষম এবং মানসিক বিকলাঙ্গ ও বিশেষ বাচ্চার স্বাবলম্বনের জন্য, তাদের সমস্যার সমাধানের জন্যও চেষ্টা করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে। 'সক্ষম' সংগঠনের নামেই এর কাজ ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হচ্ছে।

❑ আর 'আরোগ্য-রক্ষক যোজনা' কি?

❍ বড় হাসপাতালগুলি যদি ছেড়ে দেন তাহলে আমরা জানি যে ছোট গ্রামীণ ক্ষেত্রে অত্যন্ত সামান্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলিও পূর্ণ হয় না। এজন্য আমরা এক আরোগ্য-রক্ষক যোজনা চালাচ্ছি। যেটা বেশ কিছু প্রদেশে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম এবং সেবা ভারতী দ্বারা পরিচালিত। বর্তমানে প্রায় ছয় হাজার গ্রামে এর কাজ চলছে। ওই গ্রামেরই এক যুবক ঔষধের বাক্স নিজের কাছে রেখে স্থানীয় এলাকায় সাধারণ রোগের জন্য ঔষধ দিয়ে থাকেন।

❑ দেশে এরকম আরোগ্য-রক্ষক যোজনার সাথে যুক্ত ছয় হাজার গ্রাম কোথায় কোথায় আছে? পূর্বোত্তরে কোন কোন এলাকায় আরোগ্য-রক্ষক যোজনা চলছে? এর ব্যবস্থা ও ঔষধ বিতরণ কীভাবে হয়ে থাকে?

❍ এই ছয় হাজার গ্রাম পূর্বাঞ্চ ল, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্রপ্রদেশে আছে। পূর্বোত্তরেও সাত রাজ্যের মধ্যে মিজোরাম ছাড়া এই যোজনা চলছে। কারণ মিজোরামে এখন কার্যকর্তা পাওয়া যায়নি। ছয় প্রদেশে এই কার্য বেশ ভালোমতো চলছে। উত্তরপ্রদেশে "দীনদয়াল শোধ সংস্থান" দ্বারা গ্রামীণ ক্ষেত্রে এই কাজ চলে। আনন্দের বিষয়, এই ডাক্তাররা কোনও পারিশ্রমিক নেন না। তাঁরা সেবাভাব দ্বারা কার্য করেন। হ্যাঁ, আমরা তাঁদের সবরকম ঔষধের ব্যবস্থা করে দিই। তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করি। যেখানে ঔষধ বিতরণের প্রশ্ন ওঠে, সেখানে মূলত হোমিওপ্যাথি ঔষধ দেওয়া হয়। কিছু আর্য়ুবেদিক ঔষধও রাখা হয়। এবং সেইসঙ্গে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠন (WHO) দ্বারা নির্দিষ্ট তিনপ্রকার অ্যালোপ্যাথি ঔষধ যেমন প্যারাসিটামল (অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া) দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে প্রায় ২০-২৫ রোগের সূচী তৈরি রাখা হয়, যার জন্য সামান্য ঔষধেই কাজ করা যায়। একাজে হোমিওপ্যাথি সর্বাধিক, আয়ুর্বেদের কিছু এবং অ্যালোপ্যাথির কেবল তিনটি ঔষধ এতে ব্যবহৃত হয়।

❑ এছাড়া কৃষির বিকাশের জন্য স্বয়ংসেবকের দ্বারা যে কার্য হচ্ছে তাও কি সেবাকার্যের শ্রেণীর মধ্যে পড়বে?

❍ আমরা গ্রাম বিকাশের জন্য এক আলাদা বিভাগ তৈরি করেছি। যাতে প্রধানত গ্রামে পাঁচটি বিষয়ের উপর কাজ করার যোজনা আছে। আমরা গ্রামকে পরিবারের এককের থেকে একটি বড় একক বলে মনে করি। তাই গ্রাম পরিবারের মতন থাকুক এজন্য আমরা কিছু প্রয়োগ শুরু করেছি। পাঁচটিবিষয় নিয়ে কাজ করছি — (১) গ্রামে কোনও নিরক্ষর থাকবে না। (২) গ্রামে কেউ ঔষধের অভাবে অসুস্থ হবে না। (৩) কৃষিতে পরাবলম্বী থাকবে না, কারণ আজ আমরা সবুজ বিপ্লবের নামে কৃষিকার্যকে ভুল দিশায় পরিচালিত করে পরাবলম্বনকে স্বীকার করেছি। আজ কৃষকদের বীজ, সার ও কীটনাশকের জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। এর সাথে রাসায়নিক সারের ব্যবহার মাটির উর্বরা শক্তিকে শেষ করে দেয়। আমরা এক্ষেত্রে কাজ করার সময় চাই কৃষক জৈবিক কৃষির প্রতি আকৃষ্ট

"আমরা মনে করি হিন্দুত্বের প্রতি নিষ্ঠা এটা কোনও রাজনীতির বিষয় হতে পারে না। এটা আমাদের ধারণা, জীবন শৈলী। এজন্য হিন্দুত্বকে রাজনৈতিক ইস্যু করা ঠিক নয়। রাষ্ট্রীয় কল্যাণের বিষয়ে দলের পরিধির ওপর ওঠে নীতি তৈরি করার আবশ্যকতা আছে।"

হোক, স্বাবলম্বী হোক। নিজের বীজ, নিজের সার, নিজের কীটনাশক গ্রামের মধ্যেই নির্মাণ করুক। এজন্য কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার আবশ্যকতা আছে। এই দিশায় আমাদের চেষ্টা চলছে। তৃতীয় বিষয়, গ্রামের সমাজকে সংহত করার অনেক রকম উপায় আছে। যেমন পাঠশালা, পাঠকক্ষ, ভজনমণ্ডলী প্রভৃতি। মন্দির কেবল দেবতা পূজনের জন্যই নয়। মানুষকে একত্রিত করার কেন্দ্রও বটে। চতুর্থ বিষয় সমরসতা। গ্রামে সব পর্ব, উৎসবে সারা সমাজ একত্রিত হয়। এরকম সামাজিক পর্ব, মন্দিরে পূজাদি বেশি হোক, যাতে সমাজে ব্যাপ্ত বৈষম্যকে দূর করা যায়, এজন্য আমরা চেষ্টা করি। তার সাথে সাথে স্বাবলম্বনও এসে পড়ে। পঞ্চ ম বিষয় হল, আর্থিক দৃষ্টিতে গ্রামের মানুষ স্বাবলম্বী হবে। এজন্য কৃষির সাথে-সাথে মহিলাদের রোজগারের বিষয় নিয়ে অনেক স্বয়ং সহায়তা গোষ্ঠি (SHG) তৈরির প্রয়াস চলছে। এখন আমি বলতে পারি পুরো দেশে প্রায় ৬০০ গ্রামে এই প্রয়োগ আমরা চালাচ্ছি। তাতে প্রায় ১০০ গ্রাম এরকম আছে, যেখানে কিছু ফল পাওয়া গেছে। দেখানোর মত কাজ হয়েছে।

❑ সেবা ও কৃষি বিকাশের এই কার্য সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার প্রায় ৫০ বছর পর শুরু হয়েছে। তাহলে কি এই চিন্তা পরে এসেছে যে সেবা কার্যে বেশি যাওয়া উচিত? প্রথমে সঙ্ঘ শারীরিক, শাখা কার্য, গণবেশ, পথ সঞ্চ লন, সূর্য নমস্কার ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়েছিল। পরে অন্য আনুষাঙ্গিক সংগঠন তৈরি হল। সেবা কার্যে বেশি জোর দেওয়ার পিছনে কারণ কি?

❍ প্রথম অবস্থায় আমরা শাখা দ্বারা ব্যক্তি নির্মাণের কাজে বেশি জোর দিয়েছি। কিন্তু স্বয়ংসেবকরা স্বয়ং প্রেরণায় অনেক রকমের সামাজিক কার্যের সাথে যুক্ত ছিল। এর সাথে সাথে আমরা তাদের মনে আরও বেশি দায়িত্বভাব জাগ্রত করেছি। এরকমই সংগঠনের বিকাশের এক প্রক্রিয়া হচ্ছে Progressive Development। ক্রমিক বিকাশ হতে থাকে। কোনটা প্রথমে এসেছে, আবার কোনটা পরে, এরকম নয়। যখন আমরা বিকাশের অবস্থায় এ পর্যন্ত পৌঁছেছি, তখন স্বয়ংসেবকদের একটা বড় শক্তি জাগ্রত হয়েছে। তাকে সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াতে আরও বেশি লাগানো হোক, এরকম ভাবা স্বাভাবিকই ছিল। এ বিচার পূজনীয় ডাক্তারজী, শ্রীগুরুজীর মার্গদর্শনেই ছিল। পূজনীয় বালাসাহেব দেওরসজী তো সামাজিক বিষমতার বিষয় সবার সামনে বেশি বেশি করে বলতেন। এটা স্বাভাবিক এক বিকাশক্রম, ৫০ বছর পরে চিন্তা করা হয়েছে এরকম নয়। ওই বিকাশযাত্রায় আমরা এই সিদ্ধা ন্তে পৌঁছেছি যে, স্বয়ংসেবকদের শক্তি এরকম সেবা কাজে লাগানো চাই, যা পরিবর্তন আনতে পারে।

❑ আপনার মনে হয় যে এই কার্য সমাজে পরিবর্তন আনতে পারবে? পরিবর্তনের জন্য রাজনীতির কি ভূমিকা আছে?

❍ এরকমের আত্মীয়তাপূর্ণ কার্যের দ্বারাই সামাজিক পরিবর্তন আসতে পারে। রাজনীতিকে পরিবর্তনের সাথে যুক্ত করা উচিত নয়। রাজনৈতিক পরিবর্তন অনেক কারণে হতে পারে। রাজনীতি বা সরকারের ওপর সমাজ পরিবর্তনের দায়িত্ব আছে কি নাই, সেটা ভাববার বিষয়। সরকারের কাজ সাধারণ মানুষের প্রয়োজনগুলির ব্যবস্থা করা। পরিকাঠামো নির্মাণ করা, সুরক্ষার ব্যবস্থা রাখা ইত্যাদি। সমাজের পীড়া ও সংবেদনা দূর করা সব ব্যক্তির স্বভাব হওয়া চাই। এজন্য সামাজিক কার্য সমাজেরই করা চাই। আমরা মনে করি না যে, সামাজিক পরিবর্তন আইন বা সরকার দ্বারা হয়। আইন সাহায্য করে, কিন্তু তার দ্বারা সামাজিক পরিবর্তন হবে, এটা সম্ভব নয়।

❑ এত সেবাকার্য করার পরও সঙ্ঘের ছবি এত সংখ্যালঘু বিরোধী, হিংসাত্মক কেন?

❍ এজন্য কিছু রাজনীতি প্রেরিত বিষয় দায়ী এবং কিছু আমাদের কার্যপদ্ধ তিও। আমরা মনে করি যে, বেশি প্রচার -প্রসারে রুচি না থাকা উচিত। আমরা কখনও প্রচারের ওপর জোর দিইনি, কারণ আমরা চাই যে সেবা সমাজের স্বভাব হওয়া উচিত। এটা প্রচারের বিষয়----এরকমটা আমাদের মনে হয় না।

আপনার কথা ঠিক। আমাদের ভালো বিষয়গুলি প্রচার করা উচিত ছিল।

❑ এরকম তো নয় যে, আপনারা প্রসিদ্ধি চান না, এখন তো সঙ্ঘের প্রচার বিভাগ আছে। আপনার কি মনে হয় না যে, যেটা আপনি করতে চান তা সকলকে বলতে পারছেন না?

❍ আমাদের প্রচার বিভাগ তো আমাদের বিচার ধারার প্রতিষ্ঠা করার জন্য আছে। কিন্তু ব্যক্তির অন্তঃকরণে কখনও অহংকার, আত্মকেন্দ্রিকতা, ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা যাতে না আসে, এর চিন্তা আমরা করি। আমরা যা করতে চাই তা আমরা বলতে পারি না। সত্যি বলতে কী, ওইরকম মানসিকতা আমরা তৈরি করতে পারিনি। এটা আমাদের কল্পনায় ছিল না। ব্যক্তি নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করুক, নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করুক, নাম ও প্রচারের জন্য কাজ না করুক---এটাই আমরা কার্যকর্তাদের বলে আসছি।

এজন্য অনেক স্বয়ংসেবক নীরবে এরকম অনেক কার্য করে থাকেন। কিন্তু পরে যখন সেবা কার্যের জন্য আমরা সংস্থার নির্মাণ করি, তখন তা চালানোর জন্য অর্থের আবশ্যকতা হয়। স্বাভাবিকভাবে আইনের মধ্যে থেকে আমাদের ব্যবস্থা নির্মাণ করার দরকার হয়। যখন ওই ব্যবস্থা হয়ে যায়, তখন সংস্থাগুলিতে সরকারের প্রতি করণীয় নিয়মের কারণে লেখাজোখা করা ও কার্যের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত করার প্রক্রিয়া শুরু হল, যা প্রয়োজনও ছিল। মূলত সমাজের প্রতি উত্তরদায়িত্বের কারণেই তা করছি।

❑ আপনার সরল সৌম্য ব্যক্তিত্ব থেকে এরকম মনে হয় যে আপনি সেবা কার্যের জন্য প্রচারক হয়েছেন। আপনার কি ছোট থেকেই এরকম কাজের প্রতি রুচি ছিল? আপনি কখন এবং কীভাবে স্বয়ংসেবক হলেন?

❍ **আমি তো বাল্যকাল থেকেই, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীতে যখন পড়ি অর্থাৎ ১৯৫৬-৫৮ থেকে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হয়েছি। আমার সৌভাগ্য যে আমার বড় দাদা সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। তার কারণেই সঙ্ঘের শাখার সঙ্গে যুক্ত হলাম। আমার দুই দাদা নিজ দায়িত্ব পূর্ণ করে অবসর নিয়েছেন। আর এক বোন আছে।**

❑ আপনি মূলত কোথাকার নিবাসী?

❍ আমি মূলত ইন্দোর নিবাসী। কিন্তু প্রচারক হয়েছি মুম্বই-এর পাশে ডোংড়ী নামক স্থান থেকে। ওখান থেকেই আমি স্নাতক হয়েছি। সেটা ছিল ১৯৭৫ সাল, যখন জরুরী অবস্থা ঘোষণা হয়েছিল।

❑ ১৯৭৫-এ প্রচারক বের হলেন আর ২০০৯-এ সরকার্যবাহ। এরকম মনে হচ্ছে না যে আপনার সরকার্যবাহ পর্যন্ত পৌঁছনো তীব্র গতিতে হয়েছে? এবং এটা কি সঙ্ঘেই সম্ভ ব?

❍ এরকম বলতে পারি না, কারণ সঙ্ঘে তো আমার থেকেও কম বয়সের কার্যকর্তা আজ অখিল ভারতীয় অধিকারী আছেন। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই যে সঙ্ঘে কার্যপ্রবাহের সাথে সাথে দায়িত্ব প্রবাহও স্বাভাবিক গতিতে চলতে থাকে, যেটাকে অসামান্য মনে হয় না।

(এরপর ১৫ পাতায়)

সুভাষচন্দ্র বসু থেকে নেতাজী রূপান্তরের কারিগর বীর সাভারকর

অজিত বিশ্বাস

১৯০৬ সাল, বাংলায় চলছে স্বদেশী আন্দোলন। তার ঢেউ মহারাষ্ট্রের পুনাতেও পৌঁছেছে। ২৩ বছরের যুবক সাভারকর স্বদেশী আন্দোলনের নেতা। একদিন সাভারকরের হাতে এল লণ্ডন থেকে প্রকাশিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার কাগজ — 'Indian Sociologist'। তাতে ভারতীয় ছাত্রদের জন্য একটি বিজ্ঞাপন ছিল। বিলেতে লেখাপড়ার জন্য 'Scholarship দেওয়া হবে। যে সব ছাত্র পড়াশোনার পরে ইংরেজদের গোলামি করবে না। ভারতে ফিরে যাবে। সাভারকর আবেদন করল কৃষ্ণবর্মাকে। আবেদন পত্রে 'Recommend' করেছেন লোকমান্য তিলক। ফলে লণ্ডনের 'ইন্ডিয়া হাউসে' থাকার এবং পড়াশোনার ব্যবস্থা হল। নামে Bar-at-law পড়া শুরু হল। আসলে শুরু হল বিলেতে বসে স্বাধীনতার আন্দোলন।

১৯০৭ সালে '১৮৫৭'-র 'সিপাহি বিদ্রোহে'র ৫০ বছর পূর্তি স্মরণ সভা। সমস্ত ভারতীয় ছাত্রদের বুকে কালো ব্যাজ ধারণ করার আহ্বান। সাভারকর সাথে সাথে ঘোষণা করলেন '১৮৫৭' লড়াই 'সিপাহী বিদ্রোহ' নয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম — 'দি ওয়ার অফ ইন্ডিপেনডেন্টস্ অফ ১৮৫৭'। সেইসঙ্গে বই লেখার কথা ঘোষণা করলেন। ইংরেজ এই ঘোষণা শুনে বই লেখার আগেই বইটিনিষিদ্ধ ঘোষণা (Ban) করল। পৃথিবীর ইতিহাসে এর কোনও দ্বিতীয় উদাহরণ নেই।

১৯০৬ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে সারা ইউরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন কাগজে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা, ভারতের সমস্যার কথা, নিউ ইয়র্কের কাগজ 'Gaelic American'- এ ছাপা হল। অনুবাদ করে লেখা পাঠালেন জামার্নী, ফ্রান্স, পর্তুগীজ, আয়ারল্যাণ্ড ও চীনে। সাভারকর আইরিশ, মিশর, তুর্কি, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছিলেন। বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য তিনি গুরুমুখী ভাষায় লিফলেট লিখে পাঞ্জাবী সৈন্যদের ব্যারাকে পাঠাতেন।

সাভারকর কী ধরনের প্রভাব বিলেতে সৃষ্টি করেছেন সেকথা আমরা পাই লণ্ডনের Sunday Chronical-এর রিপোর্টারের-লেখনীতে, "I had an opportunity of along friendly discussion with Mr. V. D. Savarkar. ...The fact is Mr. V. D. Savarkar belives in India for Indians, in the complete emancipation of india from the British rule.

এই সময় সাভারকর ছিলেন লণ্ডনে যা ইউরোপের বিপ্লবী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র।

১৯১০-এর ১৩ মার্চ সাভারকর লণ্ডনে বন্দী হন। তারপর ১৪ বছর আন্দামানে, ১৩ বছর রত্নাগিরি জেলায় অন্তরীণ। ২৭ বছর জেলে থেকে ১৯৩৭ সালে সাভারকর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আমেদাবাদে হিন্দু মহাসভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। দেশে তখন পাকিস্তানের প্রচার শুরু হয়েছে। হিন্দু মুসলিম ঐক্য সম্পর্কে সাভারকর বলেন, 'If you come, with you, if you don't come, without you and if you oppose, in spite of you. The Hindus will Continue to fight for the National Freedom."

১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর জাপান পার্লহারবার আক্রমণ করল।

গান্ধী বলেছেন, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ছাড়া স্বরাজ্য আসবে না। কিন্তু তা হয়নি। AICC-তে গান্ধীই দেশ ভাগের প্রস্তাব পাস করিয়েছেন, ১৯৪৬ সালে জুন মাসে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সাভারকারের মাথায় নতুন চিন্তা এল। এই যুদ্ধ কে স্বাধীনতার কাজে লাগাতে হবে। এই সময় জাপানে হিন্দু মহাসভার শাখা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জাপানে হিন্দু মহাসভার সভাপতি হয়েছেন বিপ্লবী রাসবিহারী বোস। রাসবিহারী ১৯২০ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত জাপানে ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (আই এন এ)। জাপান দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে যোগ দেওয়ায়, বৃটিশ আর্মির ভারতীয় সৈন্যরা আই এন এ-তে যোগ দিলেন।

সাভারকর সারা ভারত ভ্রমণ করে স্লোগান তুললেন, 'Militatrise the Hindus and Hinduise the Politics'. সাভারকর হিন্দুদের ভারতীয় সৈন্য বাহিনীতে যোগ দেবার আহ্বান জানালেন। হিন্দুরা সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিলে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের শিক্ষা পাবে। আধুনিক যুদ্ধের সাথে হিন্দুরা পরিচিত হবে। এই সুযোগ কোনওক্রমেই ছাড়া নয়। ওই সময় কেবল মুসলমানরাই

ডাঃ হেডগেওয়ার

সৈন্যবাহিনীতে বেশি সংখ্যায় যোগ দিত। সাভারকর তার দিব্য দৃষ্টিতে বুঝতে পারলেন অবিলম্বে দেশ স্বাধীন হবে, তখন হিন্দু সৈন্যের সংখ্যা বেশি না হলে দেশ আবার পরাধীন হবে।

সুযোগ এল। হিন্দু মহাসভার সভাপতি হিসাবে সাভারকরকে দিল্লীতে নিমন্ত্রণ করলেন বড়লাট লর্ড লিনলিথগো। বিশ্বযুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে কথা বলার জন্য। সাভারকর বললেন, আমি এখনও একজন বিপ্লবী। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে Militriijation-এ ইংরেজদের সাহায্য করতে প্রস্তুত। এর ফলে গান্ধী-নেহরু সাভারকরের বিরোধিতা করলেন।

১৯৩৭-৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র বোস কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। কিন্তু গান্ধী-নেহরুর চক্রান্তে সুভাষকে কংগ্রেস থেকে বের করে দেওয়া হল। সুভাষচন্দ্র তখন ফরওয়ার্ড ব্লক তৈরি করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ কীভাবে ভারতের স্বাধীনতার কাজে লাগানো যায় তার মাথাতেও এই চিন্তা এল সাভারকরের মতো।

১৯৪০-এর ২০ জুন সুভাষ নাগপুরে গেলেন। প্রথমে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের সঙ্গে দেখা করার জন্য নাগপুর গেলেন। ১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক— জি ও সি। এই অধিবেশনে সুভাষের সাথে দেখা করার জন্য ডাঃ হেডগেওয়ার কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি যে ধরনের সংগঠন নাগপুরে ১৯২৫ সালে তৈরি করেছিলেন, সে কথা ডাক্তারজী সুভাষ চন্দ্রকে জানায়। সুভাষচন্দ্র আরও জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। সুভাষ চন্দ্র বলেন, এই ধরনের সংগঠনই কেবল কাজের হতে পারে। দেশাত্মবোধ সম্পন্ন মানুষের সংগঠন চাই।

সুভাষচন্দ্র ডাক্তারজীর সাথে দেখা করার জন্য ২০ জুন যখন নাগপুর যান, তখন ডাক্তারজী খুবই অসুস্থ। সেদিনই ডাক্তারজী পরলোক গমন করেন।

১৯৪০-এর গোড়ার দিকে বিখ্যাত বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী নাগপুরে গিয়ে ডাক্তার হেডগেওয়ারের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং সঙ্ঘের কাজ পরিদর্শন করেন। এইসব কাজ তিনি সুভাষচন্দ্রের পক্ষ থেকে করেছিলেন। সুভাষকে এই সব খবর ত্রৈলোক্যবাবু জানিয়েছিলেন।

জিন্না তখন ভারত ভাগের নানা চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তার সাথে সুভাষচন্দ্র হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বিষয়ে কথা বলার জন্য বোম্বেতে জিন্নার বাড়িতে উপস্থিত হন। ২৯

বীর সাভারকর

জুন ১৯৪০ যখন জিন্নার সাথে দেখা হল, জিন্না সুভাষের সাথে কথা বলতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। যেহেতু সুভাষ তখন কংগ্রেসের সভাপতি নন। তার ফরওয়ার্ড ব্লক তেমন বড় সংগঠন নয়। সুভাষ হিন্দু সমাজকেও প্রতিনিধিত্ব করছেন না। তাই জিন্না সুভাষের সাথে কথা বলতে রাজি হলেন না। জিন্না বললেন, আপনি বরং সাভারকরের সাথে দেখা করুন। কারণ তিনিই হিন্দুদের সত্যিকার প্রতিনিধি।

জিন্নার বাড়ি থেকে বেড়িয়ে সুভাষচন্দ্র সোজা বোম্বের সাভারকর সদনে উপস্থিত হলেন। সাধারণত বিকেলে সাভারকর কারও সাথে দেখা করেন না। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের নাম শুনে সাথে সাথে ডেকে নিলেন। সাভারকর জানতেন কংগ্রেস সুভাষকে দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সুভাষবাবুর কাছ থেকে জানতে চাইলেন তার আগামী কার্যক্রম কি? কি করতে চান তিনি? কলকাতায় ফিরে হলওয়েল মনুমেন্ট ভেঙে ফেলার কার্যক্রমের কথা জানিয়ে সুভাষচন্দ্র বললেন, জনজাগরণের জন্য এই কাজ করবেন। সাভারকর উত্তরে বললেন, এই সুযোগে ইংরেজ আপনাকে জেলে পুরে রাখবে। কী হবে এই ভাবে জেলে যাওয়ায়। সুভাষবাবু বললেন, 'আমরা তা হলে কী করব?' সাভারকর বললেন, অত্যাচারী নিষ্ঠুর বৃটিশরা সারা দেশে অত্যাচার আর শোষণ করে দেশ শাসন করছে। তখন আপনি মৃত অত্যাচারী এক বৃটিশের মূর্তি অপসারণ করতে গেলে, বৃটিশ আপনাকে জেলে আটকে রাখবে, তাতে দেশের কী লাভ হবে? আপনার মতো একজন প্রতিভাবান নেতা জেলে পচতে থাকবেন ইংরেজের ফাঁদে পা দিয়ে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। সারা দেশে আমি পরিভ্রমণ করে মিলিটারিতে হিন্দুদের প্রবেশ করানোর কাজ করছি। আমি জানি কংগ্রেসীরা এর বিরুদ্ধে প্রচার করছে। অনেকে ভাবছে আমি বৃটিশকে যুদ্ধের কাজে সাহায্য করছি। তা মোটেই নয়। আপনি শুনুন, যে সব ভারতীয় সৈনিক জার্মানী ও জাপানের কাছে বন্দী হয়েছে ছত্রখণ্ণ তাদের নিয়ে একটা মুক্তি বাহিনী তৈরি হয়েছে জাপানে ও জার্মানীতে।

জাপান থেকে বিপ্লবী রাসবিহারী বোস চিঠি পাঠিয়েছেন। সাভারকরকে কয়েক দিন আগে। এই বছরের শেষেই জাপান যুদ্ধে যোগ দিয়ে ভারতের দিকে এগিয়ে আসবে। সাভারকর সুভাষচন্দ্রকে তখন বললেন — "ith Japan' & is entry we must seek as never before a golden opportunity for invading india from outside to liberate it with the help of thousands of battle-scarred indian soldiers equiped with the latest arms from Germany

নেতাজী সুভাষ

and Japan. Considering all these it is most harmful if a leader of your stature volunters to languish in jail for a flimsy cause.

The British Government is best upon asserting you at the drop of a hat, So you should fool it to escape from India as did revolutionarie like Rashbehari who went to Japan.... Unless we make such a courageous and arimed invasion we can not liberate India. I consider you as one among the two or three leaders who are Capabls of boding such an invasion and I have Your name uppermost in my mind."

১৯৩৭ সালে সাভারকর মুক্ত হবার পরে রাসবিহারী গোপনে তাঁকে চিঠি পাঠালেন, দুজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর হাতে। ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসের সেই চিঠিতেই রাসবিহারী একজন তরুণ নেতাকে পাঠাতে লিখেছেন। ২৭ জুন ১৯৪০-এ সুভাষ চন্দ্র সাভারকরের সাথে দেখা করতে এসেছেন। রাসবিহারী জাপানে হিন্দু মহাসভার একটি ইউনিট গড়ে তুলেছেন। রাসবিহারী জাপানী ভাষায় সাভারকরের একটি জীবনী লিখে প্রচার করেছেন। সাভারকরের কাছেও সেই বই-এর কয়েকটি কপি পাঠিয়েছেন রাসবিহারী।

সাভারকরের প্রেরণায় সুভাষচন্দ্রের মহানিস্ক্রমণ ১৯৪১-এর জানুয়ারিতে ঘটল। তিনি কাবুল-রাশিয়া বার্লিন হয়ে ১৯৪৩ সালে মে-জুন মাসে জাপানে পৌঁছালেন। সুভাষচন্দ্রের জাপানে পৌঁছাবার আগেই রাসবিহারী আই এন এ (আজাদ হিন্দ ফৌজের) সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হলেন — South East Aria-র স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মেলনে। সুভাষচন্দ্র জাপানে পৌঁছাবার পর রাসবিহারী সুভাষচন্দ্রকে আই এন এ-র সর্বময়কর্তা ঘোষণা করলেন। ১৯৪৩ সালের ২৩ অক্টোবর রাসবিহারী সুভাষকে নিয়ে ৫০,০০০ সৈন্যের এক সম্মেলনে রাসবিহারী সুভাষকে পরিচয় করে দিয়ে বললেন, আজ থেকে সুভাষচন্দ্র আমাদের সৈন্য বাহিনীর নেতা। সাথে সাথে সেই ৫০ হাজার সৈন্য একসাথে 'নেতাজী জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়ে উঠল। সেদিন থেকেই সুভাষ 'নেতাজী' নামেই পরিচিত হলেন। জাপানে Interim Government of Free India গঠন করলেন। সেই স্বাধীন ভারত সরকারকে স্বীকৃতি দিল জাপান, জার্মানী, বার্মা, আইরিশ, রিপাব্লিক, ইটালি, মানচুরিয়া এবং ফিলিপাইনস।

তারপর জাপানি ও আই এন এ বাহিনী ভারতের আন্দামান নিকোবর দ্বীপ স্বাধীন করে সেখানে স্বাধীন অন্তবর্তী ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠিত করে! ১৯৪৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর নেতাজী স্বয়ং স্বাধীন আন্দামানে পদার্পণ করেন। সেখানে আই এন এ বাহিনী নেতাজীকে সামরিক কায়দায় বিশেষ সম্মান প্রদান করে। নেতাজী আন্দামান নিকোবরের নাম পাল্টে 'শহীদ ও স্বরাজ' দ্বীপ রাখেন। নেতাজী সেলুলার জেলে গিয়ে স্বর্গত বিপ্লবীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

নেতাজী সুভাষ 'Indian war of independance 1857' নামে সাভারকরের বই কয়েক হাজার তামিল ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। জাপান এই সময় Mr. J G. Ohasawa নামে এক জাপানী লেখক 'Two great Indian in Japan' নামে একটি বই লেখেন। যার মধ্যে রাসবিহারী বসু এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের প্রেরণাদায়ী জীবনগাথা রয়েছে।

এই বই থেকে আমরা সিঙ্গাপুরের পতনের কথা জানতে পারি। সিঙ্গাপুর বৃটিশদের একটা শক্ত ঘাঁটি। সেই ঘাঁটির পতনের কাহিনী এই বইতে আমরা পাই।

প্রায় ৪৫,০০০ ভারতীয় সৈন্য আই এন এ-তে যোগ দিল। রাসবিহারীর নেতৃত্বে প্রায় ৫০ হাজার সৈন্যের ফৌজ গড়ে উঠল। সাভারকরের প্রচারের ফলেই যেসব সৈন্য যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল তারাই আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেয়। নেতাজী সুভাষও তা অনুভব করেছেন। তার প্রমাণ পাই 'স্বাধীন ভারত রেডিও' থেকে ২৫ জুন ১৯৪৪ সালে প্রচারিত ভাষণে। সাভারকর সম্পর্কে সেদিন তিনি বলেন, It is heartning to know that Veer Savarkar is fearlessly inspiring the Youth of india to enlisted in the armed forces. There enlisted youth themself provide us with trained men and soldiers for our Indian National Army."

এর সাথে সাভারকর ১৯৪৪ সালে অসম বাংলা এবং তামিলনাড়ুর হিন্দু মহাসভার কার্যকর্তাদের সব রকমের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিলেন। নেতাজী যখনই ভারতে আই এন এ নিয়ে প্রবেশ করবে তখনই তাকে সাহায্য করতে হবে। সাভারকরের প্রয়াসের ফলেই সুভাষচন্দ্র বসু নেতাজী সুভাষে পরিবর্তিত হয়েছিলেন। ইতিহাসের এই ছবিটাকে কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টরা বার বার চেষ্টা করেছে 'তোজর কুত্তা' 'সাম্রাজ্যবাদীর দালাল' বলে নেতাজীর এই ঐতিহাসিক কাজকে বিকৃত করতে।

জাপানের সাহায্য নিয়ে নেহেরু নেতাজীর এই আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে ভারতকে স্বাধীন করার বিরোধী ছিলেন। নেহরু ও কংগ্রেস নেতাজীকে সহ্য করতে পারতেন না।

১৯৩৯ সালে সাভারকর কলকাতার সভায় বলেছিলেন, বৃটিশ সরকারের নীতি

(এরপর ৯ পাতায়)

বিনায়ক সাভারকরের বঙ্গ বিজয়

সন্দীপ কুমার মুখোপাধ্যায়

সালটা ১৯৩৯। অবিভক্ত বাংলায় ফজলুল হক-এর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের ক্রমবর্ধমান হিন্দু বিরোধী দৌরাত্ম্যে উদ্বিগ্ন ও কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয়তার চিন্তিত কিছু বিশিষ্ট বাঙালী এগিয়ে এলেন এই ব্যবস্থার প্রতিকারকল্পে। এঁদের মধ্যে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মন্মথনাথ মুখার্জী, ব্যারিস্টার এস এন ব্যানার্জী, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, ভাষাচার্য্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ময়মনসিংহের মহারাজা শশীকান্ত আচার্য প্রমুখ। একাধিক বৈঠকের পর ঠিক হয় যে বাঙালী হিন্দুর দুর্দশা মোচনে হিন্দুদের একটি নিজস্ব রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরি করা দরকার। প্রস্তাবটি নিয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী উপস্থিত হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসুর কাছে। উদ্দেশ্য তিনি এই নতুন দলটির নেতৃত্ব দিন। ওই কথোপকথনের সময় উপস্থিত ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্বয়ং। তিনি এবং শরৎ বসু উভয়েই হিন্দুদের নতুন দল গঠন না করে হিন্দুমহাসভাকে শক্তিশালী করার পরামর্শ দিলেন। শরৎবাবুর মত ছিল যে যেহেতু বীর সাভারকরের মতো ব্যক্তিত্ব মহাসভায় উপস্থিত, তাই তাঁর নেতৃত্বেই বাঙালী হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করা উচিত। কিছুটা বিফল মনোরথ হয়েই ফিরতে হল ডঃ মুখার্জীকে। বিনায়ক সাভারকরকে তিনি জানতেন এক দুঃসাহসিক বিপ্লবীরূপে — তাঁদের সম্যক পরিচয় ছিল না — তাই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে সাভারকরের নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন। সে সময়ে বাংলায় দুটি হিন্দু সভা কাজ করতো। একটিতে নেতৃত্ব দিতেন ব্যারিস্টার বি সি চ্যাটার্জি (ইনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জামাতা) আর অন্যটির নেতা ছিলেন বিপ্লবী আশুতোষ লাহিড়ী। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, বিপিন চন্দ্র পাল, প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-এর মতো কিছু বিশিষ্ট বাঙালী হিন্দু মহাসভায় যোগদান করা সত্ত্বেও বাংলায় হিন্দু মহাসভা তত প্রভাবশালী ছিল না।

ইতিমধ্যে খবর এল যে হিন্দু মহাসভার প্রাদেশিক অধিবেশন হচ্ছে খুলনায় এবং ওই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে আসছেন সাভারকর। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও তাঁর সাথীরা এই সুযোগ সদ্ব্যবহার করতে চাইলেন, সাভারকর ব্যক্তিত্বকে যাচাই করতে।

ঠিক হল কলকাতার টাউন হলে সাভারকরের বাংলায় পদার্পণ উপলক্ষে কলকাতার নাগরিকবৃন্দ তাঁকে সম্বর্ধিত করবেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল সাভারকরকে কলকাতায় কোথায় রাখা হবে তা নিয়ে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব দিলেন যে তাঁর লন্ডনের সহপাঠী ব্যারিস্টার নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বর্তমান লোকসভা স্পীকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পিতা) থিয়েটার রোডে যে মর্মর প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন তা সর্বতোভাবে সাভারকরকে রাখার উপযুক্ত স্থান। এন সি চ্যাটার্জী ছিলেন মস্ত ব্যারিস্টার — একে সাভারকরের হিন্দুয়ানীতে তিনি বিশ্বাস রাখতেন না, তার ওপর তাঁর প্রতিষ্ঠান বিরোধী বিপ্লবী কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁর বীতরাগ ছিল। তবুও বন্ধুর অনুরোধ তিনি ফেলতে পারলেন না।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯, সাভারকর কলকাতায় পা দিলেন। দুপুরে খাবার টেবিলে মধ্যাহ্নভোজ সবার ফাঁকে নিছক ঠাট্টাচ্ছলেই সাভারকরের কাছে জানতে চাইলেন এন সি — হিন্দুরাষ্ট্র কি? এর পরের কয়েক ঘন্টা বক্তা সাভারকর আর শ্রোতা এন সি চ্যাটার্জী। পরের দৃশ্য আরও বিস্ময়কর। দেখা গেল টাউন হলে সম্বর্ধনা সভায় সাভারকরকে নিজে স্বয়ং গাড়ি চালিয়ে

সংসদ ভবনে বীর সাভারকরের প্রতিকৃতি উন্মোচন অনুষ্ঠান। (ফাইল

উপস্থিত করলেন সে যুগের দোর্দন্ডপ্রতাপ ব্যারিস্টার এন সি চ্যাটার্জী!

টাউন হল সেদিন লোকে লোকারণ্য। হল তো দূরের কথা, হলের সামনে (প্রায় লাটভবন পর্যন্ত) হাজার হাজার মানুষ বিপ্লবী বীর সাভারকরকে দেখতে ও শুনতে জমায়েত হয়েছেন। নতিদীর্ঘ ওই মানুষটি ভীড় ঠেলে মঞ্চে উঠলেন, পরনে সাদাসিধে দেশীয় পোশাক, মাথায় মারাঠী টুপি। হাতে ছাতা। বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সাভারকরের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন — "সুশ্রী সুপুরুষ নারী সুলভ কোমলশ্রী নীতিদীর্ঘ মানুষটিকে দেখলে মনেই হয় না — এ একজন দুঃসাহসী দুর্দ্ধর্ষ অসাধ্য সাধক বীর।"

মঞ্চে উপবেশন করলেন সাভারকর। তাঁর পাশে বসেছেন ওই সম্বর্ধনা সভার সভাপতি প্রসিদ্ধ ব্যরিস্টার এস এন ব্যানার্জী। মঞ্চে র উলটো দিকে প্রথম কয়েকটি সারিতে বসে আছেন তৎকালীন যুগের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ। সাভারকরকে পরখ করতে উপস্থিত হয়েছেন — কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বাংলার বাঘ আশুতোষ পুত্র ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ব্যরিস্টার এন সি চ্যাটার্জী, রবীন্দ্রনাথ-এর ভাগিনেয়ী সরলা দেবী চৌধুরাণী, স্যার হরিশঙ্কর পাল, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সতীশচন্দ্র বসু, বেদান্তরত্ন হরেন্দ্রনাথ দত্ত, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পদ্মরাজ জৈন, মণীন্দ্রনাথ মিত্র (বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্রের পিতা), মেহের চাঁদ ধীমান, কলকাতার মেয়র সনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রমুখ।

সভার শুরুতে কলকাতার নাগরিকদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন-পত্র পাঠ করা হল। অভিনন্দনের উত্তরে বলতে উঠলেন সাভারকর। ভীড়ে ঠাসা হলে সবাই উৎকীর্ণ হয়ে আছেন সাভারকরকে শুনতে। "I have come to the Land of Vande Matarm" — এই একটি মাত্র লাইন উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিরাট জনসভা যেন উল্লাসে ফেটে পড়লো। করতালির পর করতালি তা থামতে না থামতেই আবার অযুত হস্তের করতালি। শিকাগো ধর্ম মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের "Brothers & Sisters of America" সম্বোধনে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, সাভারকরের সম্বোধনে ঠিক একই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। তাঁর প্রথম সম্বোধনেই, সাভারকর বাঙালী হৃদয় জয় করলেন। এরপর হিন্দু আন্দোলনের আদর্শ, উদ্দেশ্য, হিন্দু জাতির প্রকৃত সংজ্ঞা, হিন্দুর আশু কর্তব্য — বীর সাভারকরের অপূর্ব ইংরাজী, স্পষ্ট উচ্চারণে, পাণ্ডিত্যময় সাবলীল বিশ্লেষণে, অখণ্ডনীয় যুক্তিতে এবং দেশভক্তির অগ্নিময় ঝঙ্কারে সেই বিশাল জনসমুদ্রকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখলো। সেদিন অত্যাচারিত, নির্যাতিত হিন্দু বাঙালী সাভারকরের মধ্যে পেলেন তাঁদের নতুন ত্তন্দ্বন্দ্বদন্ত্রড়— তাঁদের ত্রাণকর্তা।

সেদিনের সভায় সভাপতির ভাষণে ব্যরিস্টার এস এন ব্যানার্জী সমস্ত সংশয়ের অবসান ঘটালেন এই বলে — "Now who and what remain to be convinced." শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁর সাথীদের সমস্ত দ্বিধার অবসান হল। দুটি হিন্দু সভাকে বিলীন করে একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগে নতুন করে গঠন করা হল হিন্দু মহাসভাকে। নতুন নামকরণ হল "বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা" — যার পতাকা তলে লড়াই করে প্রায় এক দশক বাদে বাংলার হিন্দু গরিষ্ঠ অংশকে পাকিস্তানের করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার করেন শ্যামাপ্রসাদ।

রূপান্তরের কারিগর বীর সাভারকর

(৮ পাতার পর)

ছিল ভারতের সৈন্য বাহিনীকে ভারতীয় রাজনীতি থেকে মুক্ত রাখা — ১৮৫৭-র স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে। আমাদের উদ্দেশ্য হল ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে রাজনীতি প্রবেশ করানো। কেবল তার ফলেই আমরা স্বাধীনতা অর্জন তরান্বিত করতে পারব। এই ভাবনা সাভারকর সুভাষচন্দ্রকে বোঝাতে পেরেছিলেন। তাই Indian National Army ভারতের কিছু অংশ স্বাধীন করতে পেরেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতীয় সৈন্যরা মুম্বাই করাচী প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। সাভারকর ও নেতাজীর এই প্রয়াসের ফলেই দেশ ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হয়েছিল। কংগ্রেস ও গান্ধীর অহিংসা আন্দোলনের ফলে দেশ স্বাধীন হয়নি।

১৯৩৯-এ সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে সরে যেতে গান্ধীজী বাধ্য করেন। এক জ্বলন্ত দেশপ্রেমী নিষ্কলঙ্ক নেতৃত্বকে হটিয়ে দিয়ে নেহেরুকে কাছে টেনে নিলেন। ঠিক তখন সাভারকর এই তেজস্বী, দেশপ্রেমিক, দেশভক্ত সুভাষচন্দ্রকে কাছে টেনে নিলেন। জাপানের হিন্দু মহাসভার সভাপতি বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হয়ে ভারতের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করলেন। সাভারকর ও নেতাজী সুভাষের এই মিলিত প্রয়াসের ফলে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হল। সাভারকর নেতাজী এবং আর এস এস দেশভাগের বিরুদ্ধে অখণ্ড ভারতের পক্ষে ছিল, গান্ধীও বলেছিলেন 'Viviset me before Viviset Bharat' কিন্তু হঠাৎই ৩ রা জুন ১৯৪৭ কংগ্রেসের এ আই সি সি-র সভায় গান্ধী নিজে দেশভাগের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলেন। কংগ্রেস নেতারা দেশভাগে রাজী হয়ে গেলেন। সারা দেশের হিন্দুদের উপর এ ছিল এক মর্মান্তিক আঘাত। সারা ভারতে এমন কোনও হিন্দু ছিলেন না, যে ভারত ভাগ চেয়েছিল। কেউ নয় — একটি হিন্দুও তা চায়নি। সকল মুসলমানও তা চায়নি। সকল কংগ্রেসীরাও তা চায়নি। কংগ্রেসে কিছু সংখ্যক নেতা জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে দেশভাগ কংগ্রেসের অন্যান্যদের দিয়েও তা মানিয়ে নিয়েছিলেন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র ১৯৪১ জানুয়ারিতে মহানিষ্ক্রমণ করার এক বছরের মধ্যেই ১৯৪২ সালে গান্ধীজী জওহরলালকে নিজ উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেছিলেন। গান্ধী বুঝতে পেরেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নেতাজী ভারতে ফিরে এলে ভারতকে খণ্ডিত করা যাবে না। নেহেরুকেও প্রধানমন্ত্রী করা যাবে না। ১৯৪৭ সালে নেহেরু জানতেন নেতাজীর মৃত্যু হয়নি বিমান দুর্ঘটনায়। ভারতে নেতাজীর সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিলেন সাভারকর এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। আর এস এস ১৯৪৭-এ অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভায় দাবি জানিয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজকে স্বাধীন ভারতের প্রথম সামরিক বাহিনী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক।

আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈনিকদের সসম্মানে ভারতীয় বাহিনীর অঙ্গিভূত করা হোক। আজাদ হিন্দু ফৌজের আহত, নিহত সৈনিকদের পরিবারকে সামরিক নিয়ম অনুযায়ী পেন্সন ইত্যাদিসহ প্রাপ্য সুযোগ ও সম্মান দেওয়া হোক। ১৯৪৮ সালে নেহেরু সাকুর্লার জারি করেছিলেন — আজাদ হিন্দ ফৌজের কাওকে যেন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ না করা হয়। ১৯৪৬-৪৭ সালে আর এস এস পাঞ্জাব, সিন্ধু, হিমাচল, কাশ্মীরে অগ্রণী সংগঠন হয়ে উঠেছিল।১৯৪৬-৪৭-এ এইসব অঞ্চলে কী কঠিন কাজ করে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করেছিল নেহেরু প্রত্যক্ষভাবে তা জানতেন। তাই স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৭-এর নভেম্বর মাসে জওহরলাল নেহেরু পূর্ব পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী গোপীচাঁদ ভার্গবকে নির্দেশ দিলেন — যে কোনও পরিস্থিতিতে সঙ্ঘ ও অকালি দলকে যেন কাজকর্ম করতে দেওয়া না হয়।

সঙ্ঘকে শেষ করে দেবার জন্য এবং নেতাজীকে সহযোগিতা করায় সাভারকরকে অপদস্থ করার জন্য একটা অজুহাত খুঁজছিল। আর এস এস গান্ধীজীকে হত্যা করেছে ৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮ এবং সাভারকরও এই কাজে যুক্ত ছিলেন — এই মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ইংরেজ সুলভ ধূর্ততায় নেহরু সরকার ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮-এ সঙ্ঘকে বেআইনি ঘোষণা করে দিল এবং বয়োবৃদ্ধ, প্রখর দেশপ্রেমিক সাভারকরকে স্বাধীন ভারতের জেলে পোরা হল।

নেহেরু তখনও জানতেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বেঁচে আছেন। নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ একটা মিথ্যা অপপ্রচার — এই সংবাদ নেহেরু জানতেন। নেতাজীর তখনও মৃত্যু হয়নি, আমরা এখন জানতে পারলাম নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে মুখার্জী কমিশনের রিপোর্ট থেকে। নেহরুর ক্ষমতা হারাবার ভয় থেকেই সাভারকরকে মিথ্যা অজুহাত দিয়ে জেলে পাঠালেন। এবং আর এস এস-এর মতো একটি দেশভক্ত সংগঠনকে বেআইনী ঘোষণা করলেন। দেশের চরম দুভার্গ্য নেহরুর মতো একজন চরম ইংরেজ প্রেমিক স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। সাভারকরের এই প্রচেষ্টার ফলে সুভাষ নেতাজী সুভাষে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

তথ্যসূত্র ঃ

১. Savarkar – S. M. Pandit
2. Savarkar Commemoration Volume – Savarkar Darshan Pratishthan – Bombay
3. Veer Savarkar – Profile ,of A Prophet – J. D. Joglekar
4. Sunday Chromicle, London.
৫. আর এস এস কী ও কেন? — অশোক দাশগুপ্ত
6. Veer Savarkar – Dhanaujay Keer.
7. Veer Savarkar INA's Source of inspiration .
8. Two Great Indian in Japan (Rashbihari and Nataji Subhas) – Mr. J. G. Obasawa.
9. Savarkar A Man A part – Shri Balasahave Deorws.

চিঠিপত্র

প্রসঙ্গ গোর্খাল্যাণ্ড

বলা হচ্ছে বিশেষত সি পি আই (এম) এবং টি এম সি-র পক্ষ থেকে যে বিজেপি বাংলা ভাগের চক্রান্ত করছে। কেন্দ্রে এন ডি এ সরকার থাকাকালীন তিনটি নতুন রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তা সকলেই অবহিত আছেন। তখন সি পি আই (এম), কংগ্রেস ও টি এম সি স্বীকার করে নিয়েছিল। তবে আজ গোর্খাল্যাণ্ডকে পৃথক রাজ্য হিসাবে মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? ঘিসিং-এর আমলে বুদ্ধ দেববাবু দার্জিলিং-এ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিয়েছিল। এখন বিমল গুরুং দাবি তুলেছে পৃথক গোর্খাল্যাণ্ড রাজ্যের। বি জে পি-র নির্বাচনী ইস্তেহারে বলা হয়েছে যে গোর্খাল্যাণ্ড দাবিকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার-বিবেচনা করা হবে, যদি কেন্দ্রে এন ডি এ সরকার ক্ষমতায় আসে। দার্জিলিংকে গোর্খাল্যাণ্ড বানিয়ে বাংলা ভাগের আসল কারিগর তো দুই কমিউনিস্ট পার্টি সেই চারের দশক থেকে। এখন আজকের ঘিসিং আর গুরুং-এর গুরু ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা রতনলাল ব্রাহ্মণ। বুদ্ধ দেববাবু এই সেদিন উত্তরবঙ্গে বলেছেন — ডুয়ার্সকে গোর্খাল্যান্ডে ঢোকাতে দেব না। এর অর্থ তো তিনি গোর্খাল্যাণ্ডকে স্বীকৃতি দিলেন। দার্জিলিং ছেড়ে তিনি জলপাইগুড়িকে ধরে রাখছেন। আসলে দার্জিলিং আসনটি বিজেপি পাচ্ছে জেনে বামপন্থীরা, কংগ্রেস এবং টি এম সি ভিত্তিহীন ও অবাস্তব বক্তব্য রাখছে। রাজ্য বিজেপি-র পক্ষ থেকে স্পষ্ট ভাষায় গোর্খ্যাল্যান্ডের দাবিকে সমর্থন করা উচিত। যখন মুখ্যমন্ত্রী নিজে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তখন রাজ্য বিজেপি-র পক্ষ থেকে বিরোধীদের যুক্তিকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করা উচিত।

অধ্যাপক আশিস রায়, বি গার্ডেন, হাওড়া-৩।

।। ২ ।।

এই ভোটের মরশুমে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ বাংলাভাগের বিরুদ্ধে বেশ সরগরম। প্রায় সব রাজনৈতিক দলই এ ব্যাপারে সোচ্চার। একমাত্র বিজেপি ওইসব দলের 'গেল রে, গেল রে' কোরাসের সঙ্গে গলা মেলায়নি। তাই আক্রমণের তীর তাদের দিকেই। তাছাড়া দার্জিলিংয়ের অধিকাংশ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ গোর্খাজনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা বিজেপি প্রার্থীকে লোকসভা ভোটে সমর্থন করায় সেই আক্রমণের তীর করেছে আরও ধারালো। তারা বিজেপি-কে বাংলাভাগের হোতা তথা বাংলার শত্রু বলে প্রচার চালাচ্ছে। জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

বিজেপি কিন্তু একবারও বাংলাভাগের কথা বলেনি। পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবিকেও মেনে নেয়নি। এমনকী, বিজেপি-র নির্বাচনী ইস্তেহারেও গোর্খাল্যাণ্ড রাজ্যের কথা ঠাঁই পায়নি। তাহলে বিজেপি বিরোধী ওই সব দল কেন বাংলাভাগের সিঁদুরে মেঘ দেখছে? তাদের ধারণা, বিজেপির আশ্বাস না পেলে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা লোকসভা ভোটে দার্জিলিং কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীকে সমর্থন দিত না। তাদের গাত্রদাহের কারণ, মোর্চা সমর্থন করায় বিজেপি দার্জিলিং কেন্দ্রে জিতে যাবে — পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ে পদ্মফুল ফুটবে। এযেন, যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।

তবে বিজেপি যা বলেছে তা হল, তারা ছোট রাজ্য গঠনের পক্ষপাতী। তারা যখন ক্ষমতায় ছিল তখনই উত্তরাখণ্ড, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় প্রভৃতি ছোট রাজ্য গঠিত হয়েছিল। তাই তারা ক্ষমতায় এলে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে গোর্খাদের দাবি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবে, যেমন তারা ইতিমধ্যেই তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের পক্ষে মত দিয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে অনেক সমস্যারই সমাধান বা দাবি পূরণ সম্ভব, যেখানে পৃথক রাজ্য গঠনের প্রয়োজনই হয় না।

পাহাড়ের সমস্যা সমাধানে তারা আগ্রহী। এখন তর্কের খাতিরে যদি ধরেওনি যে গোর্খাদের পৃথক রাজ্যের দাবি ন্যায়সঙ্গত, তাহলে তাকে কী অন্যায্য বা অসাংবিধানিক বলা যাবে? প্রশাসনিক সুবিধার্থে ছোট রাজ্য গঠন তো সংবিধানসম্মত। তবে দেখতে হবে, ছোট রাজ্য গঠিত হলে তা যেন স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব তথা দেশের অখণ্ডতার পক্ষে হুমকি হয়ে না দাঁড়ায়। তাছাড়া গোর্খারা তো পৃথক গোর্খা রাজ্যের দাবি জানিয়েছে, পৃথক বা স্বাধীন দেশের দাবি জানায়নি। আবার তাদের দাবির সমর্থনে তারা সশস্ত্র বা জঙ্গি আন্দোলনের পথকেও বেছে নেয়নি। বরং তারা অহিংস পথে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

এমনকী গোর্খা আন্দোলনের পিছনে কোনও বিদেশি শক্তির হাত থাকার কথারও উল্লেখ নেই কোনও গোয়েন্দার রিপোর্টে। জঙ্গি মদতের কথাও শোনা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট শাসনকালে গত শতাব্দীর নয়ের দশকে জি এন এল এফ নেতা সুবাস ঘিসিং পৃথক গোর্খা রাজ্যের দাবিতে শুরু করেছিলেন আন্দোলন। কিন্তু সেই আন্দোলনকে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতি বসু স্তিমিত করে দিতে পেরেছিলেন ঘিসিংয়ের কিছু ব্যক্তিগত দাবিকে মেনে নিয়ে। তাতে ঘিসিং যথেষ্ট লাভবান হলেও, পাহাড়ের সমস্যার কোনও সুরাহাই হয়নি। ফলে আন্দোলনের রাশটা চলে যায় গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার বিমল গুরুং, রোশন গিরিদের হাতে এবং ঘিসিংয়ের বিরুদ্ধে জনরোষ এতটাই প্রবল আকার ধারণ করে যে, ঘিসিং দার্জিলিং ছাড়তে বাধ্য হন। জ্যোতিবাবুরা দার্জিলিং সমস্যাকে ছাই চাপা দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সমস্যা এখন লেলিহান শিখার রূপ নিয়েছে। বিজেপি সেই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছে। এতে অন্যায়টা বা কী, আর মহাভারত অশুদ্ধ হওয়ারই বা কী আছে?

ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

মুসলিমদের কাছে মমতা এক নির্ভরযোগ্য বিকল্প, হিন্দুদের কাছে কে?

জনমত

উপানন্দ ব্রহ্মচারী

সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম উত্তর দৈনিক স্টেটসম্যানের বর্দ্ধিত প্রচার-প্রসার বাংলার জনমানসে এক নিশ্চিত পরিবর্তনের সূচনা নির্দেশ করে। এই বাম বিরোধী পরিবর্তনের পরিমণ্ডলে নিরপেক্ষতা এক অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে। কিন্তু বিগত কয়েক মাসে এই পত্রিকায় পরিবেশিত কিছু সংবাদ, নিবন্ধ, বিশ্লেষণ এই পত্রিকার 'হিন্দু' পাঠককুলকে চিন্তিত করে তুলছে। সংবাদপত্রের পাঠক গোষ্ঠীতে হিন্দু মুসলিম বিভাজন অনভিপ্রেত। তবুও দৈনিক স্টেটসম্যান-এ 'সংখ্যালঘু উন্নয়ন', 'মুসলিমদের কাছে নির্ভরযোগ্য বিকল্প', 'মুসলিম ভোট' ইত্যাদি নিয়ে যেরকম লেখালেখি দেখা যাচ্ছে, তাতে হিন্দু পাঠকদের মনে হতেই পারে 'সংখ্যাগুরু উন্নয়ণ', 'হিন্দুদের কাছে নির্ভরযোগ্য বিকল্প' বা 'হিন্দু ভোট' নিয়ে কোনও আলোচনা নেই কেন?

এই আলোচনার অবতরণা সেখ সদর নঈম-এর ৩রা মে' ০৯ তারিখে দৈ. স্টে-এর বিচিত্রায় প্রকাশিত — 'মুসলিমদের কাছে মমতা এক নির্ভরযোগ্য বিকল্প' ও লেখকের পূর্বের বেশ কিছু লেখালেখি প্রসঙ্গে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম উত্তর-পশ্চিমবঙ্গে এবং বর্তমান ভোট রাজনীতিতে যেভাবে মুসলমানের উন্নয়ণ, মুসলমানের অংশীদারিত্ব এবং মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক নিয়ে আলোচনা চলছে, তাতে মনে হয় শুধু মুসলমানদের উন্নয়ণ ইত্যাদি হলেই ভারতের তথা বাংলার উন্নয়ণের আর কিছু অসম্পূর্ণ থাকবে না। একথা মেনে নিলে ভারতে হিন্দুদের স্থান কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? হিন্দুদের সবকিছুই এখানে ব্রাত্য। এই নীতি অনুসরণ করেই পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দোপাধ্যায় মুসলিমদের কাছে নির্ভরযোগ্য বিকল্প হয়ে উঠতে চেয়েছেন। মুসলিম স্বার্থ দেখতে গিয়ে হিন্দু স্বার্থ কোনওক্রমেই গুরুত্ব পায়নি। তাই 'হিন্দুত্ব' ও 'বিজেপি'কে গুলিয়ে ফেলে এবং বিজেপিকে ঝেড়ে ফেলে 'সাচ্চা অসাম্প্রদায়িক' ও 'মুসলমানো কে মসীহা' হতে গিয়ে মমতা হিন্দু মা-বোন, যুবক-যুবতী, বেকার, নিপীড়িত-দরিদ্রদের কথা ভাবতে ভুলে গিয়েছেন।

অবশ্যই মুসলমানের উন্নয়ণ চাই। তার জন্য হিন্দু উন্নয়ণ চাই না কেন? সে কথা মমতাদেবী বা অন্য রাজনৈতিক দলগুলি একবারও বলছেন না। ভারতবর্ষে হিন্দুরা কি অপাংক্তেয়? মুসলিম উন্নয়ণ, সুরক্ষা, সহভাগিতার কথা বললে নিরপেক্ষতা বজায় থকে, আর হিন্দুর কথা বললে তা সাম্প্রদায়িকতা হয়ে যায়, এর কারণ কী — মমতা দেবীরা একটু ব্যাখ্যা করলে ভালো হয়।

আমি তিনটি সর্বভারতীয় দলের এবং দুটি রাজ্য দলের নির্বাচনী ইস্তাহার পড়েছি। সর্বত্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে ভয়ঙ্কর দানব আর মুসলিম উন্নয়ণকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেন শুধু মুসলমানদের ভোটেই ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলি জেতে। আর হিন্দুদের ভোট একদম ফালতু। রাজনীতির এতাদৃশ ইসলামীকরণ ভারত রাজনীতির বৈশিষ্ট্য। সেটিকে উপেক্ষা করে মমতাদেবী হিন্দুদের কাছে নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠতে পারলেন না। এটা হিন্দু জনসাধারণের কাছে এক বিরাট আশাভঙ্গ। অন্য কোনও রাজনৈতিক দলও হিন্দুর কাছে আশার আলো হতে পারেনি। যেভাবে বাংলার রাজনীতি চলে, তার আবর্ত থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেরিয়ে আসতে পারলেন না। নন্দীগ্রামে গুলি খেয়ে মরা হিন্দুর সংখ্যা ১০-এর অধিক। আর গুলি খেয়ে মরা মুসলমান এর সংখ্যা ৫-এর কম। তবুও শহীদ এক মুসলমানের মা নন্দীগ্রামের বিধায়ক হন, কোনও হিন্দু শহীদের মা সেই সুযোগ পান না। মুসলমান গরিষ্ঠ এলাকায় মুসলমান প্রার্থী দাঁড় করাতেই হবে। হিন্দু এলাকায় মুসলমান প্রার্থী দাঁড় করানো যেতে পারে। কিন্তু মুসলিম গরিষ্ঠ এলাকায় কোনও হিন্দুকে প্রার্থী করা যায় না। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নাকি তৃণমূলকে মুসলমানরা ঢেলে ভোট দিয়েছেন, তাই জেলা পরিষদে সভাধিপতি করতে হবে একজন মুসলিম মহিলাকে। দঃ ২৪ পরগনার হিন্দুরা কি মমতাদেবীর দল — তৃণমূলকে ঢেলে ভোট দেননি? তবে কেন এই হিন্দু ভোটের অবমূল্যায়ন? হিন্দুর হাতে মুসলমানের উন্নতি কি সুরক্ষিত নয়?

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি খণ্ডিত হয়েছে। মুসলমান ভাইদের অধিকাংশ এবং মুসলিম নেতৃত্বের প্রায় সকলে মনে করেছিল ভারতের মুসলমানদের আলাদা পরিচয়, আলাদা সংস্কৃতি, আলাদা ভবিষ্যৎ, তাই আলাদা রাষ্ট্র চাই। হিন্দু-মুসলমান এই দুই জাতির ভিত্তিতে দেশভাগ হল। মুসলমান ভাইয়েরা তাদের পাক (পবিত্র) রাষ্ট্র পাকিস্তান হাসিল করল। কিন্তু হিন্দুরা হিন্দুরাষ্ট্র পেল না। পেল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। হিন্দুদের তাতে এলার্জি নেই, কারণ হিন্দুরা বরাবরই ধর্ম নিরপেক্ষ। সেই নিরপেক্ষতাকে বজায় রেখেই ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। জাতীয় জীবনে তাদের প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক বিকাশ, এই উপমহাদেশের অন্য দুই 'ভারত বিচ্ছিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র' পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুসলমান থেকে কোনও ভাবেই খারাপ নয়। স্বাধীন ভারতে দুই জন মুসলমান রাষ্ট্রপতি সগৌরবে আসীন হয়েছেন, তবুও মুসলিম বঞ্চনার যে কল্প কাহিনী শোনানো হয়, তার বাস্তবতা ভারতের ও পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক দারিদ্র হিন্দুদের সঙ্গে সমগোত্রীয়। তবু মুসলমান হওয়ার কারণে তাদের উন্নতির কথা আলাদা করে বলতে হবে আর অমুসলমান হওয়ার কারণে হিন্দুদের কথা বলা যাবে না। এই ধরনের বিকল্প ভয়ঙ্কর। এই বাংলার দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত হিন্দুরা যারা ছাগলের মাংসের দোকানের, ফলের দোকানের, ছাতা-ব্যাগের ব্যবসার (ছাতা বলতে শুধু দত্ত ও পালদের ব্যবসা বুঝবেন না), রেডিমেড জামা কাপড়ের, জরির কাজ (ঢাড্ডা), পুনরাবর্তনীয় দ্রব্যের (শিশি বোতল থেকে শুরু করে কুড়ানো কাগজ, প্লাস্টিক ইত্যাদি) ব্যবসা এবং রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক মদতপুষ্ট চুরি-ছিনতাই-ডাকাতি-নারী হরণ ইত্যাদির একাধিকার (মনোপলি) ব্যবসা না করতে পারার কারণে সমাজ বিলুপ্তির পথে রয়েছেন, তাদের কথা বলে মমতা দেবী হিন্দুদের কাছেও আরেকটি বিকল্প হয়ে উঠুন এই প্রার্থনা করি।

আমি দৈনিক স্টেটসম্যানের সম্পাদকের কাছে জানতে চাই, তারা দৈনিক স্টেটসম্যান-এ বিভাগে একটি ইসলামী সাংবাদিকতা বিভাগ চালু করেছেন কিনা। উপরোক্ত নিবন্ধের লেখক সদর নঈম আগেও নানাভাবে ইসলামী ধ্যান-ধারণা জাগরুক রাখার এক সফল সাংবাদিক। তিনি আগে দেওবন্দী ফতোয়া, হজ যাত্রার ভর্তকি, ওয়াকফ বোর্ড সম্পত্তি, কলকাতা কর্পোরেশনে মুসলিম কর্ম নিয়োগ, বঞ্চনা, গিয়াসুদ্দিনের একটি বইয়ের কটু সমালোচনার মাধ্যমে তার ইসলাম প্রীতি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তিনি 'চ্যালেঞ্জ' সিনেমার 'ভজ গৌরাঙ্গ' গানের কুৎসিত চলচ্চিত্রায়ণ নিয়ে বাঙালি হিন্দু ধর্মগুরুদের প্রতিক্রিয়া, পশ্চিমবঙ্গে বাম অপশাসনে বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু মঠ মন্দিরের জায়গা বেদখল, দরিদ্রতম হিন্দুদের শিক্ষা-দীক্ষার বঞ্চনা বা তাদের কর্মহীনতা, দৈনিক স্টেটসম্যানের উপর মৌলবাদী আক্রমণ বা তসলিমাকে নিয়ে কলকাতায় ইসলামী তাণ্ডব, তার সাংবাদিকতার বিষয় হিসাবে আনতে পারেননি। তিনি বেলগাছিয়ায় গত ২০ এপ্রিল শিক্ষিত মুসলিম যুবকদের প্রতিবাদী জুতো পালিশের খবর পান, আর ২১ তারিখ সন্ধ্যায় বেলগাছিয়া একটি চায়ের দোকানে মুসলিম যুবকদের দ্বারা শ্লীলতাহানির শিকার সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৎপরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু পাড়ায় মুসলমান তাণ্ডবের ও দুটি হিন্দু মন্দির ভাঙচুরের খবর খুঁজে পান না। এভাবেই পশ্চিমবঙ্গে নগর ও গ্রামে হিন্দু মা-বোনেরা লাঞ্ছিতা। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হওয়ার পথে।

এসবই ৩২ বছরের বাম শাসনের অবদান। সেটা পাল্টাতে মমতাদেবীরা আদৌ বদ্ধ পরিকর নন। দৈনিক স্টেটসম্যান যদি এই অনিরপেক্ষতাকে প্রশ্রয় দেন তবে ভাবতে হবে, 'মুসলিমদের কাছে মমতা এক নির্ভরযোগ্য বিকল্প' এই খবরের পেছনে অন্য সমীকরণ কাজ করে। আর হিন্দুদের কাছে নির্ভরযোগ্য বিকল্প কে? — এই প্রশ্নের উত্তর মমতাদেবীদের ওষ্ঠে বারেক উচ্চারিত হবে না।

অত্যন্ত অশঙ্কিত হয়ে বাংলার হিন্দুরা দেখছে মুসলমান তোষণের কি ভয়ঙ্কর খেলা চলেছে। একটি দৈনিক পত্রিকায় আগুন খেকো এক প্রাক্তন নকশালী (এখন হিন্দু বিবাহপূর্বক ঘোর শরিয়তী শাসনের প্রবক্তা) কাগজে নিবন্ধ লিখে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, পশ্চিমবাংলার মুসলমানদের প্রকৃত বন্ধু বামফ্রন্ট। ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য কমিটি লেখাটি ছাপিয়ে লাখ লাখ কপি বিলি করে প্রচার করে "পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের, প্রকৃত বন্ধু কে!"

গায়ক থেকে রাজনৈতিক নেতা বনে যাওয়া, এক গায়িকা মুসলমান রমণীকে বিবাহে সফল তৃণমূলী নেতা, সেই লেখার পরিপ্রেক্ষিতে ওই কাগজে আহ্বান জানান — "আসুন সকলে মুসলমান হয়ে যাই।" আর সদর নঈমরা বাংলার মুসলিম জাগরণের পালে হাওয়া তোলার জন্য সবুজ রঙের প্রেক্ষাপটে তাদের নিবন্ধ প্রকাশে সফল হন। শরিয়তী ব্যবস্থায় যেন বাংলার তালিবানীকরণ সম্পূর্ণ হয়, তার প্রচেষ্টা অব্যাহত। কেউই মুসলিম ভাইদের সমান শিক্ষা-দীক্ষা-সহবতের একটি নিরপেক্ষ জাতীয় জীবনে সামিল করার কথা বলছে না। তারাও প্রলোভিত ও প্ররোচিত হচ্ছে আর একটি সম্ভাব্য পাকিস্তানের জন্য। বাংলার তিন জেলা হিন্দু সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়া হিন্দু ও অন্য ছয় জেলায় কিছু দিনের মধ্যেই দ্রুত সংখ্যালঘু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলাতেই হিন্দুরা সংখ্যালঘু ও অত্যাচারিত হবার জন্য প্রহর গুনছে। পশ্চিমবাংলার হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে গেলে রাজনৈতিক দলগুলি তখন 'হিন্দু সংখ্যালঘু উন্নয়ণের' কথা বলবেন তো?

সংখ্যালঘু উন্নয়নের এই অবাস্তব ও প্রহেলিকায় চক্রান্তে সামিল ডান-বাম-মধ্য কোনও রাজনৈতিক দলই হিন্দুর কাছে নির্ভরযোগ্য হওয়ার কথা ভাবেই না। বানের জলে ভেসে আসা (!?) বাঙালী হিন্দুর জন্য এ এক অশনি সঙ্কেত।

ভারত তথা বাংলাতে বিজেপি হিন্দুদের কাছে স্বাভাবিক বিকল্প হয়ে উঠতে পারে নিশ্চয়। কিন্তু তার আগে সাভারকরজীর সেই আপ্তবাক্য — 'হিন্দুত্বের রাজনীতিকরণ ও রাজনীতির হিন্দুত্বকরণ' বিষয়টিকে বাস্তবায়িত করতে হবে।

বিচিত্র ভারত বিচিত্র উপাসনা

বিচারক দেবতা

পরম্পরা

সোমনাথ নন্দী

সারা বিশ্বের মধ্যে ভারত সত্যই বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। এখানে দেখা যায় যেমন জীবজগত ও জনগোষ্ঠীতে বৈচিত্র্য, তেমনি চোখে পড়ে বিচিত্র উপাসনার ধারা। আছে সাকার-নিরাকারের উপাসনা। সমান্তরালভাবে চলে বৃক্ষ, শিলা, জলাশয়কে ঘিরে অদ্ভুত আরাধনা।

আজ সারা বিশ্বের মানুষ ভারতকে দেখছে বিচিত্র ভাবনার নিরীখে। বিভিন্ন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে এ দেশকে অভিহিত করা হচ্ছে 'ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া' বা অবিশ্বাস্য ভারত বলে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভারতের বিভিন্ন বিষয় প্রদর্শিত হচ্ছে অপার্থিব ভারতের খোঁজে। এই অভিধায়।

আসলে এক সময় অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত বিদেশীদের চোখে ভারতের পরিচয় ছিল ঝাড়ফুঁক, ভূত-প্রেত সাধনা ও পৌত্তলিকতার দেশ। পরবর্তী কালে স্যার উইলিয়াম জোন্স, ম্যাক্সমূলার প্রমুখ বিদেশী পণ্ডিতদের ভারত চর্চার বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে, বিশ্ব জানতে পারে ভারতের প্রকৃত পরিচয়। তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে বিবিধের মাঝে মিলন মহানের মধ্যেই ভারতের ঈশ্বর উপাসনার সারবত্তা। তাই উপাসনার মাধ্যম যাই-ই হোক, তার মধ্যে প্রাণের প্রার্থনা তাঁদের পৌঁছায় পরমপুরুষের দরবারে।

ধরা যাক, চেন্নাইয়ের কাছারী দেবতার কথা। চেন্নাই নগরী থেকে ২২০ কিলোমিটার দূরে কুলানজিপ্পার মন্দিরকে সবাই জানে কাছারী দেবালয় বলে। মন্দিরের পূজিত দেবতা হলেন কুলানজিয়াপ্পর। ভক্তমানসে তিনি ভগবান শিবের পুত্র।

কুলানজিয়াপ্পর দেবতার কাছে প্রার্থনার ধারা বিচিত্র। কোনও মৌখিক বা মানসিক প্রার্থনা নয়। আবেদন বা আর্জি জানাতে হয় বিচারালয়ের পদ্ধতি অনুসারে। অর্থাৎ লিখিতভাবে। রীতিমতো বিচারালয়ে ব্যবহৃত সবুজ ডামি কাগজে। সমস্যাগ্রস্ত মানুষ এখানে আসেন, সাধারণত সম্পত্তিগত বিবাদ, দাম্পত্য বিবাদ, খুন-রাহাজানি ইত্যাদি নিয়ে। আশ্চর্যের বিষয় এসব সমস্যার সমাধান হয় অল্প সময়ের মধ্যে। অনেক সময় জেলা আদালত বা উচ্চ আদালতের ন্যায়াধীশরাও আসনে এখানে, নিজ নিজ সমস্যার সমাধানে।

চেন্নাইতে কেবল নয়, কলকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠে আছেন এমনই এক কাছারী দেবতা।

বাংলার এই কাছারী দেবতা আছেন বেহালার ঠাকুরপুকুরের অনতিদূরে বাকরাহাটে। অঞ্চলের মানুষ বলেন বাবা বড় কাছারীর থান।

বড় কাছারী বলতে একটি বড় পুকুর পাড়ে শতাব্দী প্রাচীন এক বিশাল অশ্বত্থ গাছ। বৃক্ষমূলে শান বাঁধানো বেদী। বেদীর উপর ছাউনি। বেদীতে সিঁদুর রাঙা ত্রিশূল। এটাই সকলে বলেন বাবা ভোলানাথের আসন। কোনও পুরোহিত নেই। সকল সম্প্রদায়ের ভক্তরা আসেন এখানে সাধ্যমতো নিবেদন সামগ্রী নিয়ে। কেউ

আনেন ফল, কেউ মিষ্টি, কেউ বা বাতাসা। নিজেরাই ভোগ দেন। তারপর নিজেদের সমস্যার বিষয় একটি কাগজে বিশদভাবে লিখে ঝুলিয়ে দেন বৃক্ষশাখায়। এটাই কাছারী বাবার এজলাসে আর্জির চিঠি। হাজার হাজার ঝুলন্ত আবেদন পত্রে শোভিত বাবার এ এক বিচিত্র অঙ্গসজ্জা। কালীঘাটে বা কল্যাণীতে সতীমার নামে অনেকে মানতের জন্য ঢিল বাঁধেন। কিন্তু লিখিত আবেদনের রীতি বোধ হয় সারা বাংলার মধ্যে এখানেই একমাত্র।

আর্জি পেশের দিন একমাত্র শনি ও মঙ্গলবার। এই দুদিন বাবা বড় কাছারির থানে তো মেলা লেগে যায়। গ্রাম্য সমস্যা থেকে শহুরে সমস্যা নিয়ে আসেন নানা শ্রেণীর ভক্তজন। বাবার কাছে এই আর্জি সেসময় পৌঁছায় ১৫ থেকে ২০ হাজারে। ভক্তদের বিশ্বাস, এ আদালতে বাবার আদেশে বিচার করেন তার অনুচর ভূতপ্রেতেরা। এদের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ভক্তদের। বাবার আদেশ মতো এরাই সমস্যার সমাধান করে দেবে একেবারে ম্যাজিকের মতো, যে কোনও আদালত, পঞ্চায়েতের মোড়ল, সালিশি সভা বা স্থানীয় বিধায়কের দ্বারা যা সম্ভব নয়। তবে একটা কথা। মিথ্যা অভিযোগ দেওয়া যাবে না। সত্যি হলেই ফল পাওয়ায় সম্ভাবনা প্রবল।

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান

জল সংরক্ষণ

কমল ব্যানার্জী

পৃথিবীতে যদি জল না থাকত তাহলে কী হত? আমরা থাকতাম না। পশুপাখি থাকত না। গাছপালা থাকত না। কোনও প্রাণই থাকত না। পৃথিবী হয়ে উঠত মঙ্গল গ্রহের মতো রুক্ষ, পাথুরে। ভাগ্যিস পৃথিবীতে জল আছে। কিন্তু সমস্যা হল সব জল আমাদের কাজে লাগে না। এই গ্রহে যা জল আছে তার শতকরা ৯৭ ভাগই সমুদ্রের লোনা জল। বাকি তিন ভাগ জলের বেশির ভাগটাই দুই মেরুতে বরফ হয়ে জমে আছে যা আমরা কাজে লাগাতে পারি না। এই জল বাদ দিলে আমাদের হাতে যে সামান্য পরিমাণ জল থাকে তা দিয়েই আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজন মেটাতে হয়। এই জল পাওয়া যায় নদী-নালা-খাল-বিল পুকুর-বৃষ্টি-ভূগর্ভ ইত্যাদি থেকে। এই জলও আবার সব জায়গায় সব সময় সমানভাবে পাওয়া যায় না। তাই প্রয়োজনীয় জল ধরে রাখার চেষ্টা মানুষ প্রাচীনকাল থেকে করে আসছে। আগেকার দিনে আমাদের দেশে জল সংগ্রহের প্রধান উৎস ছিল পুকুর, কুয়ো, কুণ্ড, লেক, নদী ইত্যাদি। গ্রিক পরিব্রাজক মেগাস্থিনিসের লেখা থেকে জানা যায় যে খৃস্টের জন্মের তিনশ বছর আগেও আমাদের দেশে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য-র আমলে বৃষ্টির জল ধরে রেখে তা চাষবাসের কাজে ব্যবহার করা হত। অশোকের আমলে নিকটবর্তী নদী থেকে একটি খাল কেটে তা প্রাসাদের ভিতর নিয়ে আসা হয়েছিল। এই খাল দিয়ে মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়াও প্রাসাদে এবং আশপাশ অঞ্চলে জল সরবরাহ করা হত।

রাজস্থানে ঘরে ঘরে বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা ছিল। থর মরুভূমি অঞ্চলের গ্রামগুলিতে প্রায় প্রতিটি বাড়ির উঠোনে মাটির নীচে তৈরি করা হতো চৌবাচ্চা। বাড়ির ছাদ থেকে বৃষ্টির জল নলের সাহায্যে এই চৌবাচ্চায় এনে ধরে রাখার ব্যবস্থা থাকত। প্রয়োজনে, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে এই জল পান করার জন্য ব্যবহার করা হত। রাজস্থান এবং গুজরাটের লোকেরা প্রাচীনকাল থেকে সিঁড়ি বাঁধানো কুয়ো ব্যবহার করে আসছে। সিঁড়ি বেয়ে অনেক নীচে নেমে এই ধরনের কুয়ো থেকে জল তুলতে হয়।

আগেকার দিনে রাজা মহারাজারা জলের অভাব মেটানোর জন্য বিভিন্ন জায়গায় ছোট বড় অনেক কুণ্ড তৈরি করতেন। কুণ্ডগুলি সাধারণত বৃষ্টির জলে ভর্তি থাকত। এগুলির জল যাতে দূষিত না হয়ে পড়ে সেজন্য নিয়মিত পরিষ্কারের ব্যবস্থা থাকত। ১৬০৭ সালে রাজা সুর সিং পশ্চিম রাজস্থানের ভাডি-কা-মিলন গ্রামে এবং ১৭০৯ সালে মহারাজা উদয় সিং যোধপুরের মেহেরনগর দুর্গে জল সরবরাহের জন্য দুটি বেশ বড় আকারের কুণ্ড তৈরি করেছিলেন। বিকানীর থেকে অনুপগড় যাবার পথে ঝালোয়ালি গ্রাম। এখানে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় তিনশ পুরনো কুণ্ডের খোঁজ পাওয়া গেছে।

তামিলনাড়ুতে প্রাচীনকালে বড় বড় জলাধার তৈরি করে বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হত। পানীয় জল এবং স্নান ও অন্যান্য কাজের জন্য ব্যবহৃত জলাধারগুলি আলাদা আলাদা হত। এই জলাধারগুলিকে

স্থানীয় ভাষায় 'উরানিস' বলা হয়।

হিমাচল প্রদেশের কোনও কোনও উপত্যকার অধিবাসীরা বহুদিন ধরে হিমবাহ থেকে জলের ধারা গ্রামে নিয়ে এসে সেচের কাজে ব্যবহার করে আসছে।

মেঘালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ঝরনার জল বাঁশের নলের সাহায্যে নিয়ে এসে সেচের কাজে লাগানো বহু পুরনো পদ্ধতি।

পুনে থেকে ১৩০ কিমি দূরে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার যে পথ ধরে প্রাচীনকালে ব্যবসা বাণিজ্য করা হত সেই পথ বরাবর পাহাড় কেটে বানানো অনেকগুলি চৌবাচ্চার খোঁজ পাওয়া গেছে। এইসব চৌবাচ্চায় পথচারী এবং ব্যবসায়ীদের জন্য পানীয় জল রাখা থাকত। আগেকার দিনে প্রতিটি দুর্গেই পাথর কেটে কুয়ো, পুকুর, চৌবাচ্চা ইত্যাদি তৈরি করে প্রয়োজনীয় জল ধরে রাখার ব্যবস্থা থাকত।

সিন্ধু সভ্যতা ভারতের প্রাচীন সভ্যতা। এই সভ্যতা সিন্ধু নদের তীর বরাবর গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে এই সভ্যতা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। হরপ্পা, মহেঞ্জোদড়ো, ধোলভিরা প্রভৃতি অঞ্চলে এই প্রাচীন সভ্যতার যে ভাঙাচোরা নিদর্শনগুলি পাওয়া গেছে তা থেকে অনুমান করা যায় যে সে যুগেও জল ধরে রাখার উন্নত ব্যবস্থা ছিল।

শুধু যে পানীয় জলের চাহিদা মেটানোর জন্যই আগেকার দিনে জল ধরে রাখা হত তা নয়। চাষবাসের জন্যও জল ধরে রাখার ব্যবস্থা ছিল। রাজস্থানের মরুভূমি অঞ্চলে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। যেটুকু বৃষ্টি হয় সেই জল স্থানীয় লোকেরা নানাভাবে ধরে রাখার চেষ্টা করে। 'খাদিন' অর্থাৎ ছোট জলাশয় তৈরি করে বা জোহড় অর্থাৎ বাঁধের সাহায্যে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা এইসব অঞ্চলে বহুদিন ধরে চলে আসছে। এছাড়াও ছোট ছোট চৌবাচ্চা তৈরি করেও জল ধরে রাখা হত। এই জল চাষবাসের কাজে ব্যবহার করা হত। শুধু রাজস্থানেই নয় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও ফসল ফলানোর জন্য নানাভাবে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব পদ্ধতিতে জল ধরে রাখা হত সেগুলি নানা নামে পরিচিত ছিল। যেমন, উত্তরপ্রদেশ-এর নাম ছিল 'জল তালাশ', মধ্যপ্রদেশকে বলা হত 'হাভেলি', আবার বিহারে একে বলা হত 'অহর'।

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির যথেষ্ট উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও আজও আমরা জলের হাহাকার মেটাতে পারিনি বরং দিন দিন তা বেড়েই চলেছে। এর থেকে বাঁচার উপায় বৃষ্টির জল ধরে রাখার পুরনো পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়া।

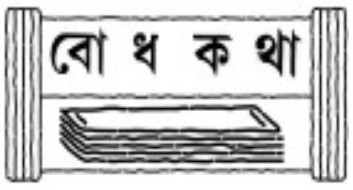

সৎ প্রচেষ্টা

সাধারণ মানুষের সেবায় কিছু করার চিন্তাটা তার খুব কম বয়সেই এসেছিল। ১৮ বছর বয়স তখন। সেই বয়সেই ঠিক করেছিলেন দশের সেবা করতে হবে। প্যাথোলজি ল্যাবরেটরি কাজকর্ম বোঝার বয়স হয়নি তার। তবুও ল্যাবরেটরির কাজে বড় হবার স্বপ্ন দেখে গেছেন। মুম্বাই-এর সুশীল কানুভাই শাহর স্বপ্ন আজ সফল।

ল্যাবরেটরির কাজ শেখার জন্য ১৮ বছর বয়সে ভর্তি হন মুম্বাই-এর গ্রান্ট মেডিকেল কলেজে। কলেজের পঠন-পাঠনটা মন দিয়ে করে গেছেন তিনি। তারই বয়সের ছেলেরা যখন অন্য কাজে সময় কাটিয়েছে, সুশীল কানুভাইয়ের তখন সে সময় ছিল না। ল্যাবরেটরির শিক্ষাটা তাই হৃদয়ঙ্গম করেছেন। যাতে শিক্ষার শেষেই নেমে পরা যায় প্যাথলজির বিভিন্ন পরীক্ষায়। যা মানুষকে চিকিৎসার সঠিক পথ দেখাতে পারে। নিজের চিন্তা আর কাজের মধ্যে গড়িমসি করেননি। যথাসময়ে হাত দিলেন প্যাথোলজির পরীক্ষায়।

ল্যাবরেটরির কাজেও তিনি মৌলিকত্ব নিয়ে এলেন। আগে যেখানে একজন ডাক্তারই সব করতেন। তিনি সে ধারণা পাল্টে দিলেন। নিজের প্যাথোলজি ল্যাবরেটরি গড়ে তুললেন নতুন ভাবে। নতুন আঙ্গিকে। পরীক্ষার জন্য সাধারণ মানুষকে অন্য জায়গায় দৌড়ে না বেড়াতে হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই সুশীল বিদেশ থেকে বড় বড় প্যাথোলজির ডাক্তার নিয়ে আসার কথা ভাবলেন। সেই সঙ্গে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি। খুব তাড়াতাড়িই সুশীলের ল্যাবরেটরির কাজ বাড়তে লাগল। দূর-দূরান্ত থেকে রোগী

সুশীল কানুভাই

আসতে শুরু করল। একই ছাদের তলায় সব ধরনের পরীক্ষার সুযোগ করে দিলেন তিনি। ডাক্তাররা সেসব দায়িত্ব সামলাতে লাগলেন। পরীক্ষার কাজ সততার সঙ্গে করে গেছেন তিনি। কোনও দুর্বলতা চেপে রাখেননি। কয়েকদিনের মধ্যেই সর্বত্র সুশীলের নাম যশ ছড়িয়ে পড়ল। রোগীদের এক বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়াল তার ল্যাবরেটরি। ৩৭০০ ধরনের পরীক্ষা হয় তার ল্যাবরেটরিতে।

সুশীল রোগীর সেবায় নিজেকে আরও নিয়োজিত করল। চালু করল শহরের অনান্য স্থানে ব্রাঞ্চ খোলার কাজ। অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীবৃদ্ধি ঘটল তার। সাধারণ মানুষকে আর বাইরে যেতে হল না চিকিৎসার জন্য। হাতের কাছেই সুশীলের ল্যাবরেটরি।

তিনি ১৮ বছর বয়স থেকে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা পূরণ হতে খুব বেশি সময় লাগল না। নিজের কাজ, কর্তব্যে তিনি কোনও দিন ফাঁকি দেননি। তার ফলও পেয়েছেন। একজন সফল ব্যবসায়ী হলেও, পরোক্ষে তিনি সমাজসেবী। রোগীর সেবা করেন। রোগীর অসহায় অবস্থার ফায়দা তোলেননি। সাচ্চা মানুষ হিসাবে কাজ করেছেন।

সুশীল কানু ভাইয়ের ল্যাবেরটরি ভারতের বিভিন্ন শহরে ও বিদেশে রোগীর সেবা করে চলেছে। এসবই সম্ভব হয়েছে নিরন্তর প্রচেষ্টা থেকে। সুশীল ভারতে প্রথম বেফারাল ল্যাবরেটরি চালু করেন। যেখানে স্পেশালাইজড পরীক্ষার সুযোগ ছিল না, তিনি তাই করেছেন।

সুশীলের মেট্রোপলিস ল্যাবরেটরির নাম এখন সর্বত্র।

চিত্রকথা ।। অমর শহীদ মহান বিপ্লবী বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে ।। ৫

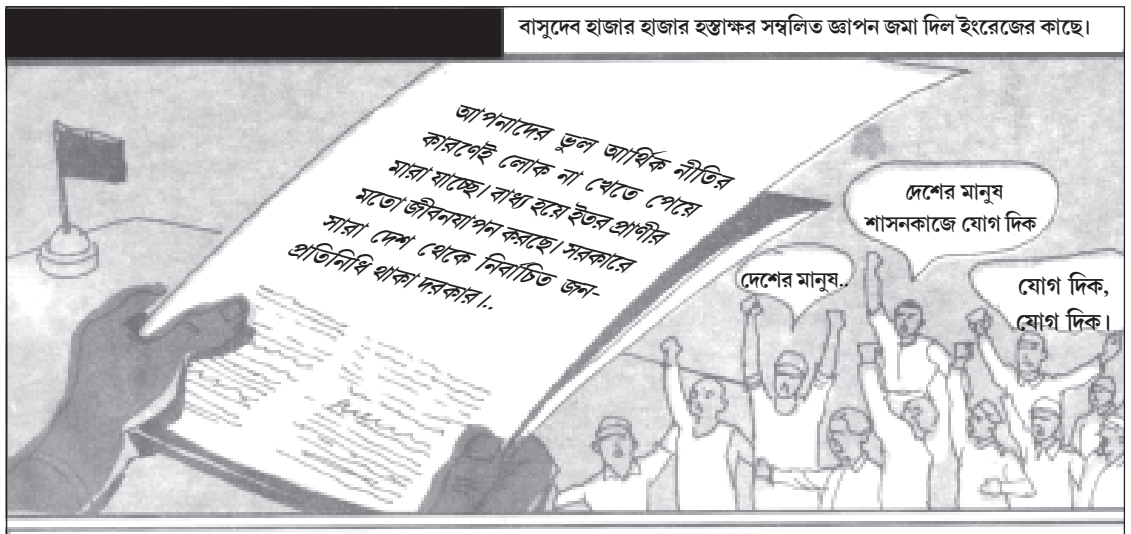

জীবনে বিজ্ঞান

।। নির্মল কর ।।

রাগসঙ্গীতে রোগ নিরাময়

সকালে চৌরাসিয়ার বাঁশিতে আশাবরী, রাতে রবিশঙ্করের সেতারে হংসধ্বনি, জ্বরে জৌনপুরী আর ঘুম না পেলে বাগেশ্রী রাগ। রোগ নিরাময়ে এরকমই প্রেসক্রিপসন করেছেন কলকাতার দি ইনস্টিটিউট অব মিউজিক অ্যান্ড মেডিসিন রিসার্চ সেন্টার। অনিদ্রা, মাইগ্রেন, হৃদরোগ, আর্থারাইটিস, স্পন্ডেলাইটিস সহ নার্ভের যাবতীয় রোগে ওষুধ হিসেবে প্রয়োগ করা হচ্ছে ভারতীয় রাগসঙ্গীত। চিকিৎসকদের দাবি, এই অভিনব মিউজিক থেরাপিতে দুর্দান্ত কাজ হচ্ছে। সঙ্গে সামান্য ওষুধ। ক্ষেত্র বিশেষে মিউজিকের তালে তালে 'ভাইরো অ্যাকোয়াটিক্স, পদ্ধতিতে কাঁপানো হয় রোগীর শয্যা।

রক্তচাপে মাকড়সার বিষ

মস্তিষ্কে রক্তচাপজনিত মারণরোগের উপযুক্ত দাওয়াই আবিষ্কার করেছেন লন্ডনের রয়্যাল ফ্রি স্কুল অব্ মেডিসিনের ডাক্তার ও গবেষকরা। তাঁরা রক্তচাপজনিত যে কোনও রোগের ওষুধ হিসেবে অ্যাজেলেন্পসিস অ্যাপাট প্রজাতির মাকড়সার বিষ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকদের। কারণ ওই জাতের মাকড়সার বিষে ওজেমা-আগা নামে যেসব উপাদান রয়েছে তা মানুষের শরীরের বাড়তি ক্যালসিয়াম নষ্ট করে দেয়। ওই বাড়তি ক্যালসিয়ামই রক্তচাপজনিত যাবতীয় রোগের অন্যতম কারণ বলে জানিয়েছেন গবেষকরা।

মেদ ঝরাতে সেলফোন

ওজন কমানোর হাজারো দাওয়াই — অধিকাংশই আমরা জানি, কিন্তু মানি কি? এবারে মানতে বাধ্য করবে সেলফোন। বার্মিংহাম ইয়ং বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যারি টাকার সেলফোনের মাধ্যমে মেদ ঝরানোর টোটকা বাতলেছেন। কাজও হয়েছে জবরদস্ত। এই বিশেষ 'ওয়েট লস ফোনের' সাহায্যে ১২০ জন মানুষ ৫ থেকে ৯.৫ পাউন্ড ওজন কমিয়েছেন। টাকারের মতে, নিত্যদিনের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী সেলফোনের মাধ্যমে যে-কোনও কিছুরই গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে।

মন্দ স্মৃতি আর নয়

যেসব স্মৃতি মানুষকে বিপন্ন করে, বিক্ষুব্ধ করে, সেই মন্দ স্মৃতিকে মুছে ফেলতে কে না চায়! সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি অব টরেন্টোর বিজ্ঞানীরা মানুষের মস্তিষ্কের যেসব কোষ খারাপ স্মৃতির বাহক, সেই কোষগুলিকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। গবেষণা এগোলে অদূর ভবিষ্যতে এক অভিনব উপায়ে ওই অবাধ্য স্মৃতিকে পোষ মানিয়ে মস্তিষ্কের খারাপ কোষগুলিকে মুছে দিতে পারবেন বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস।

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

সান্তাক্লসের মূর্তির সামনে দুই কিশোরের কথোপকথন।

১ম জন ঃ এটা কার মূর্তি রে?

২য়জন ঃ তাও জোনিস না। রবীন্দ্রনাথের যমজ ভাই রে! ছেলেবেলায় কুম্ভ মেলায় দু'ভাই হারিয়ে গেছিলেন। বড় হয়ে একজন হয়েছেন রবিঠাকুর, আর একজন সান্তাক্লস।

☺ ☺ ☺

পুলিশ ঃ এভাবে গাড়ি চালাচ্ছ কেন?

টিপু ঃ শিখছি স্যার।

পুলিশ ঃ তোমার ট্রেনার কোথায়?

টিপু ঃ ট্রেনার নেই, করেস্পণ্ডেন্স কোর্স করছি তো!

☺ ☺ ☺

সন্তু ঃ তোর বাবা খুব ঠান্ডা মানুষ, না রে!

শিবু ঃ হ্যাঁ, বাবাকে কামড়ালে মশারও নিউমোনিয়া হয়।

☺ ☺ ☺

অমল ঃ মারাদোনাকে নিয়ে সুভাষ চক্রবর্তী এত মাতামাতি করেছিলেন কেন রে?

বিমল ঃ মারাদোনা বাঁ-পায়ে ফুটবল খেলতেন তো, তাই সুভাষবাবু তাঁকে বামপন্থী ভেবেছিলেন।

☺ ☺ ☺

শিক্ষক ঃ তোর হাতের লেখা এত খারাপ কেন?

ছাত্র ঃ আমি ডাক্তার হব তো, তাই এখন থেকে প্র্যাকটিস করছি।

— নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। ইংরেজিতে 'and' বোঝাতে '&' চিহ্নটিও ব্যবহৃত হয়। এই চিহ্নটিকে কী বলে?

২। এশিয়ার কোথায় কবে প্রথম অলিম্পিক গেম অনুষ্ঠিত হয়?

৩। লন্ডনে ডাউনিং স্ট্রিটের ১০ নম্বর বাড়িটি কী জন্য বিখ্যাত?

৪। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে আকারে সবচেয়ে বড় ঃ আফ্রিকার হাতি / নীল তিমি / জলদাপাড়ার গন্ডার।

৫। চাঁদ যদি পৃথিবীর আরও কাছে চলে আসে তাহলে পৃথিবী চাঁদের চারদিকে পাক খাবে / দিন এখনকার চেয়ে লম্বা হবে / চাঁদ টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে।

— নীলাদ্রি

এরা প্রধান শিক্ষক না..... ?

বিদ্যাধর ভট্টাচার্য

পাগলদের তবুও বুদ্ধি থাকে কিন্তু ছাগলদের নৈব নৈব চ। কিন্তু রামছাগল সম্বন্ধে সব গবেষণা এখনও শেষ হয়নি। রামছাগলেরা বুদ্ধি হীন না অতিচালক, সে বিষয়ে বিস্তর মত বিরোধ রয়েছে। এবারের নির্বাচনে দেড়শো জন স্কুলের প্রধান শিক্ষক কোনও একটি বিশেষ কেন্দ্রের বামফ্রন্ট প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়ে প্রচার পত্র বিলি করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে যে কোনও মানুষ যে কোনও দলের প্রার্থীর হয়ে প্রচার করতেই পারেন, কিন্তু অমুক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে তিনি কোনও একটি দলের হয়ে ভোট চাইতে পারেন না। কারণ বিদ্যালয়টি কোনও একটি দলের নয়, এখানে সব দলমত নির্বিশেষে পরিবারের ছেলেরা শিক্ষাগ্রহণ করতে আসে। তিনি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কোনও একটি দলের হয়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করলে, বিরোধীপক্ষের পরিবারবর্গ কোনও ভরসায় তাদের ছেলেদের তার কাছে শিক্ষাগ্রহণ করতে পাঠাবে? শিক্ষক নিজে নিরপেক্ষ না হলে ছাত্রদের কোন আদর্শ শেখাবেন? দলের দুর্নীতি, চুরি জোচ্চুরিকে সমর্থন করলে ছাত্রদের সৎ হতে বলবেন কোন মুখে? বামফ্রন্টের সমর্থনকারী ওই প্রধান শিক্ষকেরা নিশ্চয়ই এতদিনে তাঁদের ছাত্রদের শিখিয়েছেন, শিল্পের জন্য বাধা দানকারী পরিবারের মেয়ে-বৌকে ধর্ষণ করলে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে না। শাসক দলের হয়ে চুরি জোচ্চুরি করলে তা অপরাধ নয় বরং তা ভালো কাজ।

পশ্চিমবঙ্গে এই গুণরত্ন শিক্ষকদের জন্য শিক্ষাগত মান বাংলার সর্বশেষ স্থান লাভ করতে আর মাত্র দুটি প্রদেশের পিছনে যেতে হবে। বিহার ভাগ না হলে সর্বশেষের আগে স্থান লাভ হত এই বাংলার। এক সময় এই বঙ্গতেই স্লোগান তোলা হয়েছিল, 'শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব।' বঙ্গদেশে এখন চুল্লু সংস্কৃতির বিপ্লব চলছে। প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের পাশে সরকারি বিশুদ্ধ চুল্লুর দোকান শোভা পাচ্ছে।

বামফ্রন্টের আমলে শিক্ষকের মাইনে বেড়েছে কিন্তু মর্যাদা বাড়েনি। দলদাস শিক্ষকদের গুণকীর্তির জন্য সমগ্র বাংলার শিক্ষক সমাজ আজ হাসির খোরাকে পরিণত। পড়াশোনা করা ব্যক্তিরা নয়, রাখাল বাগালেরা এখন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার পীঠগুলিতে অধিষ্ঠিত।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি পর্বের উপাচার্য অমিত মল্লিক। অ্যাকাডেমিক যোগ্যতা খুব বেশি না থাকলেও সিপিএমের নির্বাচনী বুথ পাহারা দেওয়াই ছিল তাঁর আসল যোগ্যতা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ধমানের সাঁইবাড়ি হত্যা মামলায় অভিযুক্ত একটি বেসরকারি কলেজের বাংলার অধ্যাপক তথা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আপ্তসহায়ক রতন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করা হয়। এই পদের জন্য তাঁর ন্যূনতম যোগ্যতাও ছিল না। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই ইতিহাস বিভাগে এক লেকচারার নিয়োগ করা হয়েছে। চন্দ্রানী ব্যানার্জী নামে এই প্রার্থী যিনি কোথাও কোনও পূর্ণ সময়ের শিক্ষকের চাকরি করেননি। অথচ সেই ইন্টারভিউতে আটাশজন প্রার্থী ছিলেন এবং এঁদের মধ্যে ছিলেন ডবল ফার্স্ট ক্লাস। একজন লন্ডনের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ ডি ছিলেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিযুক্ত হয়েছিলেন সি পি এম নেতা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সুপারিশে। এঁর কোনও পি এইচ ডি বা প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রি নেই। অথচ অন্যান্য প্রার্থীদের তা ছিল। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে দেবব্রত মাইতি নামে পার্টির খুঁটিধরা এক স্কুল শিক্ষক বহু যোগ্য প্রার্থীদের বাতিল করে উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগে লেকচারার হয়েছেন। প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল নরনারায়ণ গুপ্তর জামাই সুরঞ্জন দাস বা গোবরডাঙা কলেজের স্বপন প্রামাণিক কোন যোগ্যতায় উপাচার্য হয়েছেন তা আজ সকলের জানা। সকলেরই জানা আছে সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় কোন জাদুবলে উঁচুতে উঠেছেন। মহামহিম পবিত্র সরকার কিভাবে ৩০ বছর নিজেকে মিথ্যা ডক্টরেট ডিগ্রিধারী বলে চালিয়েছিলেন তা আজ সকলেই অবগত। এরকম প্রতারক ব্যক্তিরাই আজ সরকারি আনুকূল্য শিক্ষার সর্বঘটে কাঁঠালি কলা হয়ে রয়েছেন। ঐ দেড়শোজন প্রধান শিক্ষকও মনে হয় একই রকম জালি মাল। যোগ্যতা নয় পার্টির পোঁ ধরে প্রধান শিক্ষকের পদটি বাগিয়েছেন। ভবিষ্যতে যাতে আরও উঁচুতে উঠতে পারেন সেজন্যই বামফ্রন্ট প্রার্থীর পদ-বন্দনা। কারণ পশ্চিমবঙ্গে এখন মেধা কালচার নয় পাঁঠা কালচারের জয় জয় কার। কথায় রয়েছে, শিক্ষকেরা গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানান, কিন্তু তিনি যদি নিজেই গাধা হন তবে.....

হাতিয়াড়া শিশু মন্দিরের বার্ষিক উৎসব

হাতিয়াড়া সরস্বতী শিশু মন্দিরের বার্ষিক অনুষ্ঠান গত ৯ মে হাতিয়াড়া সাবিত্রী দেবী কাজোরিয়া সরস্বতী শিশু মন্দিরের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে সভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী শুক্লা সেনগুপ্ত। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও সরস্বতীর চিত্রে পুষ্পাঞ্জলির মধ্য দিয়ে কার্যক্রমের শুভ সূচনা করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক কেশব রাও দীক্ষিত। এছাড়া দক্ষিণবঙ্গ বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের সভাপতি ডঃ সাধন কুমার মজুমদার বিশেষ অতিথি ছিলেন।

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী ও আচার্য্য -আচার্য্যাদের বিশেষ কাজের জন্য সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

উপস্থিত বক্তাগণ ভারতীয় আদর্শে এরূপ বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীতার কথা উল্লেখ করেন।

মঙ্গলনিধি

গত ৬ মে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন কোচবিহারের নন্দা ও দ্বীপরাজ। এই উপলক্ষে 'মঙ্গলনিধি' হিসাবে বিদ্যার্থী পরিষদের প্রাক্তন নগর সম্পাদিকা তথা ভাগ প্রমুখ নন্দা তাঁর বিবাহের দিন ৫০১ টাকা উত্তরবঙ্গ সেবা ভারতীকে প্রদান করেন।

সেবা ভারতীর পক্ষে 'মঙ্গলনিধি' গ্রহণ করেন উত্তরবঙ্গের প্রান্তের প্রান্তসম্পর্ক প্রমুখ উদয় শঙ্কর সরকার।

বাঁ দিক থেকে গজানন বাপট, ডাঃ সনৎ রায় ও ডঃ পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়।

সক্ষম-এর সুরদাস জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি । গত ১০ মে বিকেলে কলকাতায় কেশব ভবনে প্রতিবন্ধীদের সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান 'সক্ষম'-এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে ভক্ত কবি সুরদাস জয়ন্তী পালিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন খড়্গপুর আই আই টি-র অধ্যাপক ডঃ পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, জন্মান্ধ সুরদাস স্বামী বল্লভাচার্যের সান্নিধ্যে এসে ভাগবৎ কণ্ঠস্থ করেন। তিনি সহস্রাধিক দোঁহা (ভজন) রচনা করেছেন — সুরসাগর গ্রন্থে তা সঙ্কলিত। তিনি ছিলেন কৃষ্ণভক্তিতে মাতোয়ারা। স্থানীয় ব্রজভাষায় তিনি ওই ভক্তিসঙ্গীত রচনা করেন। মুসলমান শাসনেও তিনি সম্পূর্ণ উত্তর-ভারত জুড়ে এক কৃষ্ণভক্তির প্লাবন আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। সমাজ থেকে সুরদাস পাননি কিছুই, অথচ দিয়েছেন সর্বস্ব। জন্মতারিখ বা সাল নিয়ে মতভেদ থাকলেও আজ থেকে প্রায় পাঁচশো-সাড়ে পাঁচশো বছর আগে তিনি ভারতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর অবদানের ফলে হিন্দু সমাজ ও হিন্দু ধর্ম এক নব প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়েছিল বলে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন। এছাড়া অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তাঁর স্বল্প ভাষণে সক্ষম-এর সাংগঠনিক কাজের পরিধি আরও বিস্তৃত করার আহ্বান জানান।

সভাপতির ভাষণে ডাঃ সনৎ রায় সংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সবার সামনে তুলে ধরেন।

পলিটব্যুরো সদস্য

(৫ পাতার পর)

হয়েছিল। এরপরেও কি তাঁকে নিরপেক্ষ বলা যায়।

সর্বোপরি ইভিএম সম্পর্কে যে ভয়ঙ্কর অভিযোগ উঠেছে এবং জনগণের মনে যে গভীর সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে, সে সম্পর্কে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই কি দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়? মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বহু অর্থ খরচ করে ঢালাও বিজ্ঞাপন দিয়ে জানালেন যে বৈদ্যুতিক ভোটযন্ত্রে কোনও কারচুপি করা সম্ভব নয়। তাঁর মতে পূর্বের ত্রুটিগুলি মেসিনের গন্ডগোলের জন্য। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যতগুলি মেশিনে কারচুপি ধরা পড়েছে, তার সমস্ত সুবিধাগুলি পেয়েছে কিন্তু বামফ্রন্টের প্রার্থীরা। এটা কোন জাদুতে সম্ভব তার ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায়নি। ইভিএমে যে কারচুপি সম্ভব এটা রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কেন বুঝতে চাইছেন না তাও সবাই জানেন।

সংবিধান ও আইনবহির্ভূত পন্থায় শাসক দলকে নির্বাচনে জিতিয়ে যদি শাসককুলের বদান্যতায় ওপরে ওঠার সিঁড়ি বেয়ে শাঁসালো পদ বাগানো যায়, তবে তা ছাড়তে কেউ রাজী হয়! গত বিশ বছরে এমন পদ প্রাপ্তি শাসকদলের বেশ কয়েকজন অনুগত আই এ এস অফিসারের ভাগ্যে ঘটেছে। আর সে কারণেই বিরোধী দল, জনগণ এবং বিদ্বজ্জনের শত অভিযোগ অনুযোগ তা সে যতই তথ্যভিত্তিক হোক না কেন, তা কানে তোলার প্রয়োজনই বোধ করেননি রাজ্য ও নির্বাচনী প্রশাসন। তবে জনগণ নিজ দায়িত্বে সাহস করে যেখানে নেমেছেন, সেখানে সব বাধা নির্মূল হয়েছে। এবারের নির্বাচনে বিদ্বজ্জন ও জনগণের সম্মিলিত জোট বহুস্থানে প্রশাসকের ভূমিকা নিয়েছে।

বাংলা রূপকথার গল্প ফিরে আসুক

দীপেন ভাদুড়ী ।। সম্প্রতি চারদিন ব্যাপী নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হল বিভিন্ন মঞ্চে । প্রযোজনায় "নবাঙ্কুর" নাট্যগোষ্ঠী। ১৭, ১৮, ১৯, ২৭-এ এপ্রিল নাট্যোৎসবে নানা নাটক উপহার দিল বিভিন্ন গোষ্ঠী।

নাট্যোৎসবের আহ্বায়ক বিশ্বনাথ

সাউ জানালেন, এই নাট্যোৎসব পঞ্চ ম বার্ষিক। অংশগ্রহণ করে ৯টি গোষ্ঠী। যথা কলাকৃতি, কথন কলকাতা, বাঁশদ্রোণি সব্যসাচী, তরঙ্গ নট, প্ল্যাটফর্ম, থিয়েটার ফর ইউ, ইদানিং, কালাপানি, ঐহিক।

শেষদিন ২৭ এপ্রিল রবীন্দ্র সদনে সন্ধ্যায় নবাঙ্কুরের প্রযোজনায় অনুষ্ঠিত হল দুটি একাঙ্ক নাটক। 'হ্যারি এন হরি" এবং "পাঞ্চ " নাটক দুটির রচনা, মঞ্চ , প্রয়োগ শান্তনু চক্রবর্তী।

"হ্যারি এন হরি" নাটকের শুরুতে "হ্যারি'স ফ্যান ক্লাব"-এর সদস্য কর্তৃক হ্যারি বন্দনা মনোগ্রাহী হয়েছে। নতুন ধরনের উপস্থাপনায় নাটকের গভীরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এ ধরনের প্রচেষ্টা ধন্যবাদার্হ। নাটকের মূল বক্তব্য হ্যারি পটার হাউসের সঙ্গে হরির দাদুর সৃষ্টি লাইব্রেরির সংঘাত। সে লাইব্রেরিতে সুকুমার রায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত বই, ঠাকুরমার ঝুলি প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের রূপকথার গল্পের বই এবং ছোটোদের জন্য অমর সাহিত্য রয়েছে। সেই কিশোর সাহিত্যের লাইব্রেরি ধবংস করে হ্যারি পটারের প্রতিষ্ঠাকল্পে লোভনীয় এক কুপনের লটারি হয়। লন্ডন ঘোরা এবং প্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখানো হয়। পরিবর্তে বাংলা বই-এর প্রসার নষ্ট করতে হবে।

হরির ভাগ্যে সেই কুপন লাভ হওয়া সত্ত্বেও তার দাদুর সৃষ্টি বাংলা

'হ্যারি এন হরি' নাটকের একটি দৃশ্য।

সাহিত্যের লাইব্রেরি ধবংস না করে কুপনটি ছিঁড়ে ফেলে দিল এবং হরির বন্ধুরা অর্থাৎ টনি, পিঙ্কি, মন্টি — এরা সকলে বুঝতে পারে লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা। স্বপ্নের ভিতর দিয়ে গুপী, বাঘা তাদের এ সন্ধান দিয়েছে। তারা সকলে হ্যারি হাউস ধবংস করে।

এ ধরনের নাটক শিশু কিশোর মনের বিকাশে সহায়ক। বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত পথের দিশারী এই নাটক।

টনি-সুমিতা দত্ত, মন্টি-দীপা সাউ, পিঙ্কি-সাত্যমী ব্যানার্জী। হরি-সৌভিক হালদার-এর অভিনয় সাবলীল। এবং নাটকের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে। বাঘা-কৃষ্ণেন্দু দত্ত, গুপী-সম্বিত দাস, পিসি-মুকুলিকা দত্ত যথাযথ।

পরের একাঙ্কটির নাম "পাঞ্চ "। এ নাটকটি রচনা, মঞ্চ প্রয়োগে শান্তনু চক্রবর্তী। গ্রামের মেয়ে ফুলকি দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার জন্য। তার অভীষ্ট লাভের পথে নিরন্তর চলে তার সাধনা। বক্সিং রিং-এ নেমে তাকে সাফল্য পেতেই হবে। চিরাচরিত বাধা এবং বঞ্চ না অতিক্রম করে গ্রাম্য মেয়ে সাফল্যের পথে চলেছে এগিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে।

রিয়ার চরিত্রে মুকুলিকা দত্ত, জিয়া —সুমিতা দত্ত, দর্শকের মন কেড়ে নিতে সমর্থ হয় তাদের অভিনয় প্রতিভা দ্বারা। ফুলকি — পারমিতা পাঠক। রণদা — সিধু ভট্টাচার্য যথাযথ।

নবাঙ্কুরের এই দুটি নাটক পঞ্চ দশ বর্ষের প্রযোজনা। নাটক দুটির আলোয় ছিলেন অমিতাভ সেনগুপ্ত এবং আবহে ছিলেন অনিন্দ্য নন্দী।

শব্দরূপ - ৫০৯

কৌস্তভ দাস

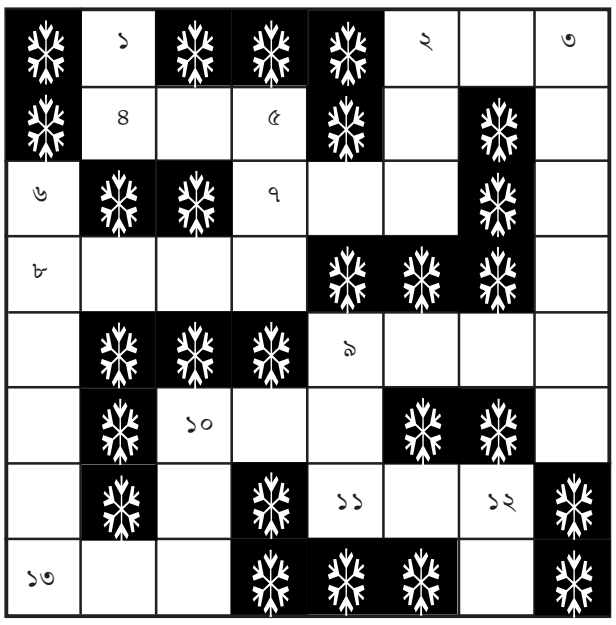

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. শিব ও শক্তির পরস্পর মিলিত রূপ, তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ, শেষ দুয়ে নোংরা, ৪. এই সরোবর কৈলাস পর্বতে অবস্থিত হ্রদবিশেষ, ব্রহ্মার মনঃ কল্পিত, ৭. অষ্টনাগের অন্যতম, এই সর্প অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে দংশন করে, ৮. বৈদিক ঋষি, হালের এক গায়ক, অন্য নামে অগ্নি, দুয়ে-চারে শব-দাহের চুল্লি, ৯. ব্রহ্মা, বিষ্ণু-এর সাথে উচ্চারিত শিব, একে-চারে নশ্বর, ১০. প্রতিশব্দে বিশেষণে দেহধারী, মূর্ত, দেহবিশিষ্ট, ১১. ফারসি শব্দে প্রদীপ দিতে হবে, বাতি, শেষ দুয়ে ক্রোধ, ১৩. বলরাম-এর অস্ত্র।

উপর-নীচ ঃ ১. সত্য, গভীর জ্ঞান, যথার্থ, ২. পুরোহিত, যজ্ঞকর্তা, ৩. রামচন্দ্রের দুই অনুজ ভ্রাতা, ৫. প্রতিশব্দে নীতিনিষ্ঠা, সাধুতা, সত্যাশ্রয়িতা, ৬. মনসা মঙ্গল-এর প্রধান দুই নারী চরিত্র, ৯. সপ্তর্ষি মন্ডলের অন্যতম নক্ষত্র, ব্রহ্মার মানসপুত্র, ১০. একই শব্দে চাঁদের অংশ, মাছের আঁশ, শেষ দুয়ে যন্ত্র, ১২. শিবের হাতে নিহত অসুর বিশেষ, হাতি।

সমাধান শব্দরূপ ৫০৭

সঠিক উত্তরদাতা

শান্তনু গুড়িয়া
বাগনান, হাওড়া।
শৌণক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৭

■	সু	দা	মা	■	হ	■	■
■	■	ন	■	■	রি	দ	ম
প	■	বি	ভী	ষ	ণ	■	হা
র	জ	ক	■	ষ্ঠী	■	■	সা
শু	■	■	মে	■	প	রা	গ
রা	■	প	রি	ণ	য়	■	র
ম	য়	রা	■	■	ম	■	■
■	■	ত	■	অ	ন্ত	রা	■

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ৮ জুন ২০০৯ সংখ্যায়।

ব্রতী স্বয়ংসেবক হোন

(৭ পাতার পর)

❑ আপনার বয়স এখন কত হল ?

❍ এখন তো ৬১ পুরো হয়েছে।

❑ ও ! তাহলে পূজ্য সরসঙ্ঘচালক মাননীয় মোহন ভাগবতজী আপনার থেকে কম বয়স ?

❍ হ্যাঁ। বয়সে তো ছোট, কিন্তু অনুভবে আমার থেকে বড়।

❑ আপনি সরকার্যবাহ, আপনাকে তো সমগ্র দেশের বিষয়ে চিন্তা করতে হয়। বর্তমান সময়ে যেটা সবচেয়ে বেশি আসন্ন সংকট যা সঙ্ঘ জনজাগরণ দ্বারা মোকাবিলা করছে—সেটা কি বিষয় ?

❍ আজ যদি সবচেয়ে বড় সমস্যা বলা যায়, তাহলে আমি বলব যে সেটা হিন্দুত্বের জাগরণের বিষয়। হিন্দু সমাজে সিদ্ধান্তের সাথে সাথে ব্যবহারিক বিষয় নিয়ে সমাজ নিজের সব ভেদভাব ভুলে গিয়ে দাঁড়াবে---এই বিষয়টা অনেক বেশি জোরের সাথে রাখার আবশ্যকতা আছে। বাহ্য সংকট তো আছেই, তার সাথে সাথে সমাজে অন্তর্নিহিত চ্যালেঞ্জগুলির প্রতিও অতটাই গভীরভাবে বিচার করা দরকার। সন্ত্রাসবাদও এক বড় সমস্যা;তার বিরুদ্ধে সমাজ নির্ভয় হয়ে উঠে দাঁড়াক, এটা জরুরী। এছাড়া ধর্মান্তরণ এক বড় ষড়যন্ত্ররূপে দেশব্যাপী চলছে। সমাজের গরীব ও ভোলে-ভালে মানুষকে কপট জালে ফাঁসিয়ে মতান্তরিত করা হচ্ছে। একে রোখার জন্য, মতান্তরিত বন্ধুদের ঘরে ফেরানো সুনিশ্চিত করার জন্য সমাজকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। হিন্দু চিন্তনে এর প্রতিরোধ ও বিজয়শক্তি আছে। কেবল তার জাগরণের আবশ্যকতা আছে।

❑ অর্থাৎ কি হিন্দু বনাম হিন্দুর চ্যালেঞ্জের প্রতি ?

❍ হ্যাঁ, হিন্দু বনাম হিন্দু। আমরা চাই যে সমাজ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াক, আত্মবিশ্বাসের সাথে দাঁড়াক। এবিষয়ে আমাদের অধিক মনোযোগ দিতে হবে। বাকি সংকট তো আসবে যাবে। তার সাথে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের অনুভব হচ্ছে যে, সমাজ এক হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মোকাবিলা করলে বিজয় অবশ্যই মিলবে।

এরকম আমি মনে করি, সন্ত্রাসবাদের উত্তর সমাজের সংগঠনে মধ্যে আছে। সমাজ জাগরণই সন্ত্রাসের সমাধান।

❑ যখন আপনি হিন্দুত্বের বিষয়ে বলছেন তখন লোকেরা বলছেন যে আপনি বিভেদ সৃষ্টি করছেন। আপনারা সংখ্যালঘু বিরোধী, মুসলিম ও খৃস্টান বিরোধী। এই সময় হিন্দুত্বের উপর যা আঘাত হচ্ছে, সেই বিষয়ে আপনি কি বলেন ?

❍ হিন্দুত্ব বিভেদ সৃষ্টি করে না,বরং সমানতা, বন্ধুত্ব ও গণতান্ত্রিক ভাবনাকে সম্মান দেয়। এই দেশে বহুমতবাদ বিবিধতার মধ্যে একতার ভাবনা তথা সর্বপন্থ সমভাব তখনই সম্ভব হয়, যতক্ষণ হিন্দুত্বকে মেনে চলার লোক বহুসংখ্যক থাকে। মানুষ সময়ে সময়ে হিন্দুত্বের অনেক পরিভাষা দিয়েছেন, তবুও তো মানুষ হিন্দুত্ব নিয়ে চর্চা করেন। এরকম চর্চা থেকে আমাদের ভয় পেলে হবে না। হিন্দুত্ব আমাদের পরিচয়, এই শব্দ নিয়েই আমরা চলতে থাকব।

এই শব্দের সাথে অনেক প্রকার ভাবনা যুক্ত আছে। নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে ভারতের পরিচয় হিন্দু শব্দের সাথে যুক্ত। ভারতের প্রত্যেক সামাজিক জীবনের মূল হিন্দুত্বেই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু আজ যেরকম রাজনীতি চলছে তাতে শব্দের ভুল অর্থ করা হচ্ছে। যদিও সর্বোচ্চ আদালতও বলে দিয়েছেন, হিন্দু কোনও সম্প্রদায় নয়, এক জীবন পদ্ধতি। এই সত্যকে স্বীকার করার মানসিকতা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের লোকেদের থাকা উচিত।

কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজনীতিতে একে স্বীকার করার এক সংকুচিত ভাব আছে---এরকম আমরা মনে করি। লাগাতার কয়েক শতাব্দী থেকে হিন্দু সমাজের ওপর অমানবীয় স্তরের আক্রমণ হয়ে আসছে। আজকের স্থিতিতে যা ভিন্ন রকমের। অমানবীয় স্তরের আক্রমণের সাথে বৌদ্ধিক জগতেও ভ্রম সৃষ্টি করে হিন্দুদের প্রতি আক্রমণ করা হচ্ছে। বৌদ্ধিক আক্রমণ নামে নতুন আক্রমণ শুরু হয়েছে। এই সমস্যার একমাত্র উত্তর হচ্ছে পরম্পরা অনুসারে হিন্দু জীবন মূল্যবোধগুলির মান্যতাপ্রদানকারী সমাজকে জাগ্রত এবং সংগঠিত করা।

❑ বাকী রাজনৈতিক দলগুলিতেও হিন্দু আছে, তাহলে আপনার এই ধারণার প্রতি কেন তারা সহমত হচ্ছেন না ? হিন্দুত্বের আগ্রহ রাজনৈতিক লাভের প্রশ্ন নয়, সংঘ কি এই ধারণাকে ঠিকমতো বোঝাতে পারেনি ? বাকী পার্টি বা বিচারধারার সঙ্গে সঙ্ঘের সম্বন্ধ কেমন হওয়া উচিত।

❍ এর একটাই উত্তর যে পরম্পরা অনুসারে হিন্দু জীবনকে মেনে চলা হিন্দু সমাজ জাগ্রত ও সংগঠিত হোক। বাস্তবে হিন্দুত্ব কি এটা অন্য রাজনৈতিক দলগুলি বুঝতে পারছে না, বা বুঝতে পেরেও রাজনৈতিক দৃষ্টিতে লাভ-লোকসানের কথা চিন্তা করে এবিষয়ে সত্য কথা বলতে মনে হয় সাহস রাখে না। সবার সামনে হিন্দুত্বের বিষয়টি লাভ-লোকসানের বিষয় না হওয়া উচিত। হিন্দুত্ব আমাদের সামাজিক রাষ্ট্রীয় পরিচয়। হতে পারে যে আমরা তাদের হিন্দুত্বের বিষয়ে ঠিকমতো বোঝাতে পারিনি। যখন অন্য রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্কের প্রশ্ন আসে, আমরা তো প্রথম থেকেই অনেক প্রকার মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি। পূজনীয় শ্রীগুরুজীর অনেক রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সম্পর্ক ছিল। দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজীর সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিচারধারার অনেক নিকট সম্পর্ক ছিল, বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু আজ এরকম মনে হচ্ছে যে সকলে দলগত বিচারের উর্ধে উঠে, মতভেদের ওপরে উঠে দেশ ও সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান করা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য হল, দলগত মতভেদের ওপর উঠে বিচার করার পরিস্থিতি ক্ষীণ হতে যাচ্ছে।

❑ দলগত মতভেদের ওপর উঠে চিন্তা করার পরিস্থিতি কেন ক্ষীণ হচ্ছে?

❍ কারণ ক্ষমতাই সব রকমের শক্তির কেন্দ্র হয়ে গেছে। দেশ তাদের দৃষ্টিতে ছোট হয়ে গেছে। ক্ষমতাই বড় হয়ে গেছে। ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বেশি থাকে। ক্ষমতায় গিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি দাবি করেন যে তিনি সমাজের সেবা করার জন্য যাচ্ছেন। আমরা তো তাঁর ভাবনাকে সম্মান করি যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সমাজের সেবা করবেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে তিনি নিজ স্বার্থের জন্য কাজ করছেন। এটা খুবই কষ্টদায়ক হয়। আজকের রাজনৈতিক পরিবেশ আমরা যখন দেখি যে খুব সহজেই মানুষ এদিক থেকে ওদিকে লাফায়, দল বদল করেন। তাহলে সিদ্ধান্ত নীতি কোথায় থাকল ? যদি কেউ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের আধারে চলেন, তাহলে বিচারের ভিন্নতা থাকলেও কোনও ব্যাপার নাই। রাষ্ট্রের বিকাশের ব্যাপারে, আর্থিক নীতির বিষয়ে, সুরক্ষার বিষয়ে, বিভিন্ন দেশের সাথে সম্বন্ধ রাখার বিষয়ে আলাদা-আলাদা বিচার হতে পারে। কিন্তু তার আধার কী হবে? ব্যক্তি হিত না রাষ্ট্র হিত? আমরা প্রথম থেকেই চাইছি প্রত্যেক দল রাষ্ট্রহিতকে ভিত্তি করে নিজ নিজ কার্যক্রম তথা নীতির পরিকল্পনা করুক।

❑ হিন্দুত্বনিষ্ঠ রাজনীতির সফলতা কোথায় এবং কীভাবে মাপবেন ? এখনও পর্যন্ত কাশ্মীরের হিন্দুরা ফিরে যায়নি এবং রামসেতুর ওপর আঘাত হচ্ছে?

❍ মুখ্য বা প্রধান বাধা হল ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতা। তারা ভারতীয় আস্থার ওপর সবরকমের দ্বিচারিতা দেখান। নিজেকে নাস্তিক মানেন। বাংলার সাম্যবাদীরা যারা ধর্ম ও দেবতাদের বিরোধিতা করেন, সরস্বতী পূজাতে ছুটি কেন দেন? ওখানে ক্ষমতায় বসে আছেন এমন রাজনৈতিক দলের লোকেরা দুর্গা পূজার কমিটিতে কেন অংশ নেন? যদি ওনাদের দুর্গার প্রতি বিশ্বাস না থাকে, সরস্বতীর প্রতি বিশ্বাস না থাকলে এরকম আয়োজনের নেতৃত্ব কেন করেন? এরকম করে তারা নিজের বিচারধারার সাথেই ধোঁকা দিচ্ছেন। কখনও কখনও মনে হয় যে সমাজে পরিচিতি বাড়ানোর জন্য নিজের সিদ্ধান্তের সাথে বেইমানী করেন। তাই এরকম ব্যবহার দেখে ওনাদের প্রতি কি বিশ্বাস জাগবে? কেমন করে মানুষ ওদেরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখবেন? আমরা তো চাই যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের নেতা এমন হোক, যাতে মোটামুটি শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হতে পারেন। এই দেশে এমন এক প্রজন্ম ছিল, যারা রাজনৈতিক দল ও বিচারধারার ওপর ওঠে একসাথে সমাজ বিষয়ে বিচার করতেন। এখন এরকম দেখা যায় না।

যেখানে হিন্দুত্বের বিষয়ে রাজনীতি যা আপনার প্রশ্ন, আমরা মনে করি হিন্দুত্বের প্রতি নিষ্ঠা এটা কোনও রাজনীতির বিষয় হতে পারে না। এটা আমাদের ধারণা, জীবনশৈলী। এজন্য হিন্দুত্বকে রাজনৈতিক ইস্যু করা ঠিক নয়। রাষ্ট্রীয় কল্যাণের বিষয়ে দলের পরিধির ওপর ওঠে নীতি তৈরি করার আবশ্যকতা আছে।

❑ হিন্দুবিদ্বেষী রাজনীতির কারণে কি রামমন্দির হচ্ছে না, কাশ্মীরে হিন্দুরাও ফিরতে পারছেন না এবং ধর্মান্তরকরণও বন্ধ হচ্ছে না ? গো-হত্যার ওপরও বাধা আসছে না ? এসব তো রাষ্ট্রীয়তার ওপর আঘাতের মূল বিষয়।

❍ এসব বিষয় কেবল ধার্মিক মনে করা উচিত নয়। গো-হত্যার বিষয়ই হোক, আর কাশ্মীরি হিন্দুদের ফেরতের প্রশ্ন বা রামসেতু---এসব দেশের বিকাশের সাথে যুক্ত। এসব না করলে দেশের ক্ষতি হবে। এ কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের ক্ষতি নয়। গো-হত্যার সাথে ভূমির উর্বরতা যুক্ত, এরকম রামসেতুর বিষয় পর্যাবরণ, শক্তি, সাগরতটের সুরক্ষার সাথে যুক্ত। এসব কেবলমাত্র ভাবাত্মক বিষয় নয়। এটা ঠিক যে ভাবাত্মক বিষয়ে মানুষ তাড়াতাড়ি স্বীকার করে। এজন্য প্রায়ই এসব বিষয়গুলির ভাবাত্মক রূপ দেওয়া হয়। কিন্তু আমার মনে করি যে সমাজের অন্যান্য দিকগুলিও বুঝুক এবং তারপর রাজনৈতিক দলগুলিও এসব বিচার করুক। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আন্তরিকভাবে চাইলেও রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে মানুষ নিজের মনের ভাবনা খোলাখুলি ব্যক্ত করার সাহস দেখাতে পারেন না। কে না চায় যে এখানে সমান নাগরিক আইন হোক? বলে থাকেন যে কথা তো ঠিকই, কিন্তু আমি বলতে পারব না। লোকের ভোট ব্যাঙ্কের ভয় আছে। রামসেতু বিষয়ে যদি বলা যায়, তাহলে বড়-বড় মানুষ ওখানে যান এবং বলেনও যে ওটা শ্রদ্ধার কেন্দ্র, তা বাঁচানো উচিত। যখন বাবরি ধাঁচা ছিল তখনও সেটা লোকেরা মন্দির বলত। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থের সামনে সত্যও উপেক্ষিত হতে থাকে।

❑ আপনার মনে হয় কি যে এরকম রাজনীতির উদয় হবে যারা ভারত ভক্তির বিষয়—অযোধ্যাতে মন্দির নির্মাণ, রামসেতু সংরক্ষণ, কাশ্মীরি হিন্দুদের ফেরত পাঠানো, ধর্মান্তরকরণ রোধ, ৩৭০ ধারার লোপ প্রভৃতি বিষয়গুলি ঠিকভাবে সমাধান করবে? এটা কি সম্ভব?

❍ এরকম রাজনীতির উদয় তখনই সম্ভব হবে, যখন জনসাধারণও এইসব কথাগুলি বুঝে ভোট দিতে যাবেন। যতক্ষণ না রাষ্ট্রীয় সমাজ এই বিষয়গুলি গভীরভাবে বুঝে রাজনেতাদেরকে নির্বাচন না করবেন, ততক্ষণ পরিবর্তন হবে না।

❑ সে সময় কি এসে গেছে?

❍ এরকম মনে হয় জাগরণের ঢেউ উঠেছে। এর প্রতি যদি সামান্য দৃষ্টি দেওয়া যায় তাহলে পরিবর্তন আসতে পারে। আমি কোনও রাজনৈতিক দলের কথা বলতে চাই না। কিন্তু হিন্দু ভাবনাগুলিকে জাগ্রত করার সময় কেবল শুধুমাত্র সংখ্যার প্রভাব না চিন্তার প্রভাব এবং চাপও হওয়া চাই। সাধারণ মানুষ প্রত্যেক বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে পারেন এরকম না। তাৎক্ষণিক ঘটনার প্রভাবে প্রভাবিত হন। এটা স্বাভাবিক, কিন্তু এর সাথে সাথে চিন্তা করতে পারেন এরকম ব্যক্তির শক্তিও সঠিক দিশায় বৃদ্ধি পাওয়া চাই। উপরোক্ত বিষয়ের ওপর নিঃসংকোচে দৃষ্টিকোণ রাখার মতো কিছু দল এই দিশায় চিন্তা করছেন। কিন্তু এটা ব্যতিক্রম রূপেই আছে।

❑ অর্থাৎ .....স্পষ্ট করুন।

❍ গণতন্ত্র স্বীকার করার কারণে যারা বেশি ভোট পাবেন তাঁরাই জিতে যাবেন। ভোট দাতারাও জাগরিত হয়ে ভোট দিক — এরকম ধারা এখনও দুর্ভাগ্যবশত এখানে নাই। এজন্য যদি আমাদের চিন্তা ঠিক হয়, তাহলে ওই চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন এরকম লোকেদের দ্বারাও সমাজ জীবনে প্রভাব পড়ে। সঙ্ঘ এই কাজই করছে। সঙ্ঘ চায় যে আমাদের চিন্তনের লোক অধিক প্রভাবিত ও জাগরিত হোক, তথা জাগরুক হয়ে ভোটদান করুক এবং সাংবিধানিক অধিকারগুলির প্রয়োগ করুক।

❑ স্বয়ংসেবক একজন ভোটদাতাও, আবার নাগরিকও। একজন ভোটদাতা ও নাগরিক হওয়ার কারণে স্বয়ংসেবক কোন বিষয়ের ওপর দৃষ্টি রাখবে ?

❍ আমরা তো এবার বলেইছি পূজনীয় সরসঙ্ঘচালকজীর আহ্বান এসেছে যে, ১০০% ভোটদান হোক। এই দেশের দুর্ভাগ্য যে ৪০% থেকে ৫০% ভোটদান হয়। তার মধ্যে যারা এক তৃতীয়াংশ ভোট পায় সেই দলও ক্ষমতায় এসে যায়। এই স্থিতির পরিবর্তন আনা চাই, তাই জাগ্রত ভোটদান এবং সবার ভোটদান হওয়া চাই। দেশের সংবিধান যে অধিকার দিয়েছে সেই অধিকারের প্রয়োগ করার মানসিকতা তৈরি চাই। এজন্য আইন তৈরি করার পক্ষে আমরা নই, যে ভোট না দিলে শাস্তি হবে। এর প্রয়োজন নাই, এজন্য প্রেরণা জাগানো চাই। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক সমাজের মধ্যে যায়, এই বিষয়গুলি নিয়ে যাতে ভোটদানের আগ্রহ বাড়ুক এবং অধিকাধিক লোক যাকে চাইবেন তিনি জয়ী হোন। কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অবশ্যই ভোট দিতে হবে।

❑ স্বয়ংসেবকদের জন্য এক বাক্যে আপনি কি বলবেন ?

❍ রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সঙ্ঘের যে প্রতিজ্ঞা আছে, স্বয়ংসেবকরা নিঃস্বার্থভাবে তন-মন-ধন দ্বারা তা পালন করুক। এটাই স্বয়ংসেবকের ব্রত। আমরা এরকম স্বয়ংসেবক হই অর্থাৎ সবাই "ব্রতী স্বয়ংসেবক হোন"।

Swastika
25 May - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

মহাপ্রস্থানের পথে রাজ্য সি পি এম

নবকুমার ভট্টাচার্য।। অন্তিম যাত্রা শুরু হয়ে গেল বামফ্রন্টের। বাংলায় বদলের হাওয়ায় নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটালো জনগণ। তিন দশক ধরে চলা দম্ভ অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যের জবাব দিল মানুষ। বিরোধী ঝড়ে লাল দুর্গ চুরমার। একেবারে গোহারা হারল সি পি এম। সন্ত্রাস, রিগিং, ই ভি এম মেসিনের কলাকৌশল, পুলিশ প্রশাসনের সৌজন্য — কোনও কিছুই জেতাতে পারল না বামফ্রন্টকে।

লোকসভা ভোটে রাজ্যের ফলাফল বামফ্রন্ট ১৫ আর বিরোধীরা ২৭। বামফ্রন্টের ১৫টির মধ্যে সি পি এম মাত্র ৯ এবং শরিকেরা কেবল ৬। এমন নয়ছয় অবস্থা ৩২ বছরে এই প্রথম। এরকম হবে তা জানা ছিল না বামপন্থী নেতাদের। মাটির সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় সিপিএম নেতারা খবরও রাখেননি তাঁদের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষ কেন মূক থেকে মুখর হয়েছেন। পাহাড় থেকে সাগর পর্যন্ত দশটি জেলায় সিপিএম নিশ্চিহ্ন। আরও দুটি জেলার অর্ধেক অংশ কেড়ে নিয়েছে বিরোধীরা। এমন কী লাল দুর্গ বলে পরিচিত বর্ধমান পূর্ব কেন্দ্রে সি পি এমের অনুপ সাহা জয়ী হলেও এখানে বিরোধীদের প্রাপ্ত ভোট অনেক বেশি।

সম্মিলিত বিরোধী জোট হলে সিপিএম এই কেন্দ্রে জয় পেত না। একই অবস্থা হত আলিপুরদুয়ার ও বালুরঘাট কেন্দ্রে।

গত ভোটে পাওয়া ৩৫টি থেকে এবার ২০টি আসন হারাতে হয়েছে বামফ্রন্টকে। এর মধ্যে সব থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে সিপিএমের। গতবারে তাদের একার আসন ছিল ২৬টি এবং শরিকদের ৩টি করে। এবার সব থেকে লাভবান তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের আসন সংখ্যা ১ থেকে ১৯ হয়েছে। কংগ্রেস দার্জিলিং হারিয়ে নতুন সংযোজন মালদা উত্তর আসনে জয়ী হয়েছে। তাদের আসন সংখ্যা ছিল ৬, এবারও তাই রয়েছে। এস ইউ সি ১টি আসন পেল এবং বিজেপি পাহাড়ে পদ্মফুল ফোটালো। দার্জিলিং আসনটি প্রত্যাশা মতো বিজেপি পেয়েছে। পাহাড়ের মতো সমতলেও বিজেপির ভোট দেখে অন্য দলগুলি চিন্তিত। লাল দুর্গ বর্ধমান-পূর্ব কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর হালদার ৭১৬৩২ ভোট পেয়েছেন। এবারে লোকসভার সঙ্গেই বিধানসভা ভোট হলে ১৯৬টি আসন বামফ্রন্টের হাতছাড়া হতো। অসীম দাশগুপ্ত, নিরুপম সেন, গৌতম দেব, কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, সুদর্শন রায়চৌধুরী, পার্থ দে সহ অনেক মন্ত্রীর পরাজিত হয়ে অজ্ঞাতবাস নিশ্চিত ছিল। আপাতত তা মুলতুবি রইল। বিনয় কোঙার একদিন বিরোধীদের পাছা দেখানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁর দলের মহিলা কর্মীদের, আজ বাংলার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভোটের বাক্সে সি পি এমকে পাছা দেখিয়ে তার বদলা নিল।

বেচারা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য! গত বিধানসভায় ২৩৫টি আসনে জেতার পর ছিলেন দলের সম্পদ, আর এখন বামপন্থী সমর্থকদের কাছেই তিনি হয়ে উঠেছেন আপদ!

সৌজন্য : সংবাদ প্রতিদিন

মধ্যপ্রদেশ

ব্যক্তি বিরোধিতাতেই বিজেপি বেহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। প্রার্থী বদল করা বা না করা — দুটোর ক্ষেত্রেই যে নির্বাচনী রাজনীতি প্রভাবিত হয় তা দেখা গেছে মধ্যপ্রদেশে। মাত্র ক'মাস আগেই রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে শিবরাজ সিং চৌহানের নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। কিন্তু সদ্য সমাপ্ত লোকসভার নির্বাচনে দল ততটা ভালো ফল করতে পারেনি। কমপক্ষে ছয়টি নামী-দামী কেন্দ্রে দলের হেভিওয়েট প্রার্থীরা পরাজিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরাজয় প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা নয়, ব্যক্তি বিরোধিতা। ওই সবকটি কেন্দ্রই বিজেপি-র দুর্গ বলে পরিচিত ছিল। যেমন — উজ্জয়িনী, মন্দাসোর, মাণ্ডলা, খাণ্ডয়া, দেবাস এবং রাজগড়। রাজ্যে ওই সব দুর্গে রথী-মহারথী প্রার্থীরা কংগ্রেস দলের প্রার্থীদের হাতে কুপোকাৎ হওয়াতে দল রাজ্যে ১৬টির বেশি আসন দখল করতে পারেনি। অথচ ওই ছয়টি কেন্দ্রেই বিজেপি প্রার্থীরা একাধিকবার বিজয়ী হয়েছিলেন পূর্ববর্তী বিভিন্ন নির্বাচনে। অপরপক্ষে কংগ্রেস দলের আসন সংখ্যা তিনগুণ বেড়ে ১২-তে পৌঁছে গিয়েছে। বিজেপি এই পরাজয়ের কারণ সমীক্ষা করবে বলে জানিয়েছে।

জয়গাঁয় মুসলিম দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব

সংবাদদাতা ।। গত ২ মে মোবাইল চুরিকে কেন্দ্র করে বচসা-মারামারির ঘটনায় দুই যুবকের মৃত্যু হয়। এদের একজন আহিদুল মিয়াঁ, যে নাকি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী। অন্যজন সন্ধিৎ দাহাল দলসিংপাড়া চা বাগানের বাসিন্দা। এই দু'জনের মৃতদেহ পাবার পর স্বাভাবিক ভাবেই এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়।

৩ মে কয়েক'শ মুসলিম ঝর্ণাবাড়ি, গয়াবাড়ি, ডালদাবাড়ি প্রভৃতি স্থান থেকে লাঠি, তরবারিসহ জয়গাঁ বাজারে এসে ৩/৪ ঘন্টা ধরে তান্ডব চালায়। বেছে বেছে হিন্দুদের অটো পুড়িয়ে দেয়, দোকানে ভাঙ্গচুর চালায়। এই সময় স্থানীয় পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। আর এস পি শ্রমিক সংগঠনের নেতা মোহম্মদ তাহির হোসেন নিজে এই তান্ডবের নেতৃত্ব দেন বলে অভিযোগ উঠেছে। মুসলমানদের এই তান্ডবের সংবাদ দাবানলের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রতিক্রিয়ায় আশেপাশের বিভিন্ন চা বাগান এবং বস্তি থেকে শয়ে শয়ে হিন্দু যাদের মধ্যে নেপালী ভাষী এবং আদিবাসী সমাজের মানুষ বেশি, তারাও কুকরী এবং তীরধনুক নিয়ে জয়গাঁ অভিমুখে রওনা হয়।

এই সময় কিন্তু পুলিশ বন্দুক উচিয়ে ও কাঁদনে গ্যাসের সেল ফাটিয়ে হিন্দু জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে হটিয়ে দেয়। এই ঘটনার পর বিজেপি-র আলিপুরদুয়ার জেলার সভাপতি শ্যামাপদ সান্যাল্যের নেতৃত্বে একটি দল জয়গাঁ যায় এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন। আইজি'র সাথে দেখা করে ডেপুটেশন দেন।

জয়গাঁ থানার ওসি প্রদীপ সরকারের অপসারণ, নিরপরাধ হিন্দুদের মুক্তি, দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানায়। এই ঘটনার সিডিসহ অভিযোগের বিভিন্ন দস্তাবেজ আই জি-কে দেওয়া হয় এবং তিনি আশ্বাস দেন যে এই দাবি বিবেচনা করে দেখা হবে। স্থানীয় সি পি এম নেতা সুভাষ বিশ্বাস কেন ওইদিন সকালে মুসলিম বস্তিতে গিয়েছিলেন — এই প্রশ্ন আই জি-কে করা হলে তিনি আমতা আমতা করেন।

৫ মে উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ উদয় সরকারের নেতৃত্বে আর এস এস-র একটি দল জয়গাঁর স্বয়ংসেবক-কার্যকর্তাদের সাথে মিলিত হন এবং হিন্দুদের সংগঠিত থাকার উপর জোর দেন।

৫ মে আই জি-র উপস্থিতিতে শহরে শান্তি মিছিল বের হয়, যার ৯০ শতাংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের।

উল্লেখ্য, বেশ কয়েক বছর ধরে মুসলিমদের সংখ্যা এই অঞ্চলে অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি হয়েছে এবং নানা অসামাজিক কাজকর্ম, যেমন — গরু কেটে মাংস পাচার, হিন্দুদের গোশালার জায়গা দখলের চেষ্টা চলছে। এতদিন মুসলিমরা আরএসপি এবং সিপিএমের সঙ্গে ছিল। বর্তমানে কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকেছে বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করে।

জয়গাঁয় দুষ্কৃতীদের হামলা।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ
সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

ব্যক্তি নির্মাণ প্রক্রিয়ার একটি অঙ্গ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ

স্বামী সারদাত্মানন্দ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে বর্গের উদ্বোধন করছেন। ছবি ঃ সুব্রত চট্টোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গত ১৫ মে হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশু মন্দিরে শুরু হল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গের প্রথমবর্ষ ও বিশেষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ। প্রদীপ প্রজ্বলন ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্পণ করে শিবিরের উদ্বোধন করেন ঐতিহাসিক সারদা মঠের সম্পাদক স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ। স্বামীজী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, 'আজ এই মঞ্চে ঠাকুর রামকৃষ্ণ মা সারদা ডাক্তারজী শ্রীগুরুজী ও স্বামী বিবেকানন্দের চিত্র শোভা পাচ্ছে। যে সুশৃঙ্খল জাতি গঠনের স্বপ্ন স্বামীজী দেখেছিলেন, সঙ্ঘ তার সার্থক রূপায়ণ করছে। তার প্রচারিত ভাবধারাই একদিন সারা পৃথিবীকে প্লাবিত করবে। ভারতের সনাতন ধর্মই সারা দুনিয়াকে পথ দেখাবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকরী মন্ডলের সদস্য জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী বলেন, 'সংস্কার প্রক্রিয়াই সঙ্ঘ কাজের ভিত্তি। ব্যক্তির গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের গুণগত পরিবর্তন। মনুষ্যত্বের বিকাশই সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের লক্ষ্য। সচেতন, সংগঠিত, সশক্ত, স্বাভিমানী, পরাক্রমী সমাজ নির্মাণ করার লক্ষ্যেই সঙ্ঘ কাজ করছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সর্বাধিকারী দুর্গাদাস রায়চৌধুরী, অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ, সহক্ষেত্র প্রচারক অজিত মহাপাত্র ও প্রান্ত কার্যবাহ ডঃ তিলকরঞ্জন বেরা প্রমুখ।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com